মাসুদ রানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

অদৃশ্য শক্তি

এক

'আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, রানা।'

অন্যমনস্ক ভাবে তর্জনী দিয়ে বাম চোখের নীচটা চুলকালেন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের প্রধান মেজর জেনারেল রাহাত খান। একটু যেন বিব্রত দেখাচ্ছে বৃদ্ধকে। এই অতি সাধারণ ব্যাপারে রানাকে বলতে বাধো বাধো ঠেকছে তাঁর, কিন্তু ওদিকে স্পষ্ট অনুভব করতে পারছেন যে ব্যাপারটা আপাত দৃষ্টিতে যাই মনে হোক না কেন, আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ একজন সংবাদ বাহকের কাজ এটা নয়, কিন্তু রানাকে বোঝাবেন কি করে? রানা কেন, যে কোন এজেন্টই এই এ্যাসাইন-মেন্টের কথা শুনলে ক্ষেপে উঠবে। অথচ এদের কাউকে বুঝিয়ে বলবার মত তথ্য নেই ওঁর হাতে। ব্যাপারটা শুধুই অনুমান।

শুধু তাই নয়, এর মধ্যে আর কোন প্যাঁচ থাকারও সম্ভাবনা আছে। বি. সি. আইয়ের সেরা এজেন্টকে

চেয়েছে দেবাশীষ, জানিয়েছে ও নিজে শত্রুপক্ষের শুটিং রেঞ্জে রয়েছে বলে কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে—কিন্তু ব্যাপারটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেকথা জানায়নি। কাজটা বাংলাদেশের এজেন্টের পক্ষে কতখানি বিপদজনক, জানায়নি। এই অবস্থায় কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না বলেই গত দুইদিন ধরে অস্থির হয়ে রয়েছেন তিনি। শেষকালে রানাকে ডেকে সবটা ব্যাপার আলোচনা করবার ছল করে পেড়েছেন কথাটা। অথচ আজই কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলে দেখা করবার কথা রিপোর্টের জন্যে।

'ছমাস আগে দেবাশীষ অনুরোধ করেছিল বেনাপোল বর্ডারে যেন ওর মালপত্র সার্চ করা না হয় তার ব্যবস্থা করতে—আমরা সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।'

'চোরাচালানের ব্যাপার নাকি, স্যার?'

'কি জানি। তবে যাই হোক ব্যাপারটা যে গুরুত্বপূর্ণ তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। নইলে এত গোপনীয়তার প্রয়োজন হত না ওর। বরাবরের মত মিশনের মাধ্যমে বা পোষ্টে পাঠিয়ে দিত কিম্বা নিজে এসে হাজির হত।'

'দেবাশীষ দত্ত কি আমাদের পে রোলে আছেন, স্যার?'

'না। ঠিক পে রোলে নেই। খুলনার বিরাট ব্যবসায়ী ও। গত কয়েক বছর ধরেই ও আমাদের অনিয়মিত ভাবে তথ্য সরবরাহ করে আসছে। কিছু কিছু খুবই দামী তথ্য পেয়েছি আমরা ওর কাছ থেকে। ওর ব্যাপারে তন্নতন্ন ভাবে সিকিউরিটি চেক-আপ করা হয়েছে অত্যন্ত

যন্ত্রের সাথে। সব পরিষ্কার। কোথাও কোন খুঁত নেই। কিন্তু তবু একজন এ্যামেচারের ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস রাখতে ভরসা পাই না। তুমি ত ওকে চেন রানা, চেন না? তোমার কি মনে হয়?'

'আমার ধারণা, আপনি ঠিকই ধরেছেন স্যার, গভীর কোন চক্রান্তের খবর পেয়েছেন উনি। ছয়মাস ধরে যে ব্যাপারের পিছনে লেগে থেকে তার মর্ম উদ্ধার করতে হয়, সেটা বিরাট কিছু হবার সম্ভাবনাই বেশি।' মেজর জেনারেলের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে স্বস্তির আভাস ফুটে উঠতে দেখে ভাল লাগল রানার। 'আর পরিচয়ের কথা জিজ্ঞেস করছেন স্যার, আমার সাথে পরিচয় খুবই সামান্য। একাত্তুর সালের এপ্রিলের শেষের দিকে দিন তিনেকের জন্যে আলাপ হয়েছিল। স্ত্রী এবং ছোট এক বোনকে নিয়ে বর্ডার পেরোবার সময় বিপদে পড়েছিলেন ভদ্রলোক, সেই সময় কিছুটা সাহায্য করেছিলাম। তারপর ভুলেই গিয়েছিলাম। আর কোন খবর পাইনি ওদের আজ সকাল পর্যন্ত।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইলেন বৃদ্ধ রানার দিকে। ঘড়ির দিকে চাইলেন। বিকেল পাঁচটা। ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেটের মাথায় দেড় ইঞ্চি লম্বা হয়ে যাওয়া ছাইটা আর আত্মসম্বরণ করতে না পেরে হুড়মুড় করে ধসে পড়ল টেবিলের পুরু কাচের উপর। ভ্রু কুঁচকে কটমট করে চাইলেন বৃদ্ধ হাতে ধরা সিগারেটের দিকে, তারপর একই ভংগিতে ফিরলেন রানার দিকে—যেন রানারই দোষ। ফুঁ দিয়ে

ছাই ঝাড়লেন টেবিলের উপর থেকে, তারপর তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখ জোড়া ফিরে এল আবার রানার মুখের উপর।

'আজ সকাল মানে? ভেঙে বল।'

'হঠাৎ আজ সকালে আমার অফিসে এসে হাজির হয়েছে ওর বোন। রিতা দত্ত। দেবাশীষ দত্তের চিঠি নিয়ে এসেছিল ও।' পকেট থেকে একটা খাম বের করে এগিয়ে দিল রানা। হাত বাড়িয়ে খামটা নিলেন মেজর জেনারেল, কিন্তু সেটা না খুলে চেয়ে রইলেন রানার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। রানা বলে চলল, 'প্রথমে আমাকে অনুরোধ করল ওর সাথে কলকাতায় বেড়াতে যাবার জন্যে। আমি রাজী না হওয়ায় বলল, এটা নাকি ওর দাদার অনুরোধ। ব্যস্ততার অজুহাত দিতেই বের করল এই চিঠি। তাও যখন রাজি হলাম না, তখন প্রলোভন দেখাবার চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে উঠে পড়ল মেয়েটা, কিন্তু যাবার আগে বলে গেল, যদি মত পরিবর্তন করি, যদি কোনক্রমে হাতের কাজ এড়ানো সম্ভব হয়, তাহলে যেন ওকে খবর দিই, আজই রাত আটটার ফ্লাইটে যাবার কথা, সাতটার সময় জানালেও ভিসার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। যখন বললাম আমার পাসপোর্টই নেই, তখন হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।'

কিছুক্ষণ আনমনে সিগারেট টানলেন মেজর জেনারেল, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'মেয়েটার বয়স কত? দেখতে কেমন?'

ও বাবা! এই বুড়োও আবার সোহানার মত প্রশ্ন শুরু করল কেন?

'খুবই সুন্দরী স্যার। বয়স হবে—এই, আঠার-উনিশ। কি বিশ।'

চিরতার পানি খাওয়া মুখ হল রাহাত খানের। রানার সাথে অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েদের মেলামেশা মোটেই পছন্দ করেন না উনি। ওঁর ধারণা, রানাকে নষ্ট করার জন্যে ক্ষেপে আছে পৃথিবীর সমস্ত সুন্দরী মেয়ে। ওঁর মত ব্রহ্মচারী জীবন যাপন করতে দিচ্ছে না ছেলেটাকে।

'আর প্রলোভন? কি ধরনের প্রলোভন দেখাবার চেষ্টা করেছিল?'

চুপ করে রইল রানা। দেশ সেকেণ্ড পরেও যখন সপ্রশ্ন দৃষ্টিটা সরল না ওর মুখের উপর থেকে, তখন মিনমিন করে বলল, 'বলল, এখন আর ছোট নেই, গত দুই বছরে দেহ-মন সব দিক থেকে যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে ও, ওর সংগ খারাপ লাগবে না আমার।'

ওফ্! বুড়োর চেহারাটা এবার দেখার মত হয়েছে। রানা ভাবল, পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ যে এক বিছানায় রাত কাটাবে আজ বাকি অর্ধেকের সাথে, এই মহা দুঃসংবাদটা শুনলে বোধহয় হার্টফেলই করবে বুড়ো।

কিন্তু না, সামলে নিয়েছেন মেজর জেনারেল, মাথা নাড়লেন ভ্রু কুঁচকে।

'অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে কি পরিমাণ ডেসপারেট। যে কোন

মুল্যে সাহায্য দরকার ওদের। কী এমন বিপদ হল...' অনেকটা আপন মনে কথাগুলো বলতে বলতে খাম খুলে চিঠিটা বের করলেন বৃদ্ধ, মন দিলেন পড়ায়।

প্রিয় মাসুদ রানা,

আমাকে চিনতে পারবেন কিনা জানি না। তবু অনেক দাবী নিয়ে লিখছি আপনার কাছে। একাত্তুরের এপ্রিলে আপনার কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছি সেটা ভুলবার নয়। সে ঋণ শোধ করতে পারব না কোনদিন।

কাগজে দেখেছি আপনার গোয়েন্দা সংস্থার অদ্ভুত সব কীর্তির কথা। অনেক কষ্টে আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করে রিতাকে পাঠালাম আপনার কাছে। সব কথা ওর মুখেই জানতে পারবেন। এখানে শুধু এইটুকুই বলতে পারি, আমি ভয়ানক রকমে বিপদগ্রস্ত। পাকিস্তান আর্মির তাড়া খাওয়ার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আপনার সাহায্য আমার একান্তই দরকার। টাকা পয়সার ব্যাপারে কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না, যথেষ্ট টাকা আছে আমার। আমার প্রাণের উপর হামলা হওয়ার আশংকা দেখা দেয়ায় আপনাকে পাশে চাইছি। আমার বিশ্বাস, আপনার মত সাহসী ও বুদ্ধিমান বন্ধুর সাহচর্য পেলে এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা করতে পারব। মাত্র সাত দিন। তারপরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। নিশ্চিন্তে ফিরতে পারব আমরা বাংলাদেশে।

মাত্র সাতটা দিন। আমার একান্ত অনুরোধ, যেমন

ভাবেই হোক সময় করে নিতেই হবে। রিতার সাথে চলে আসুন—প্লিজ।

বিনীত সাহায্যপ্রার্থী
দেবাশীষ দত্ত।

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। 'নাহ্। বোঝা গেল না। শুধু বোঝা যাচ্ছে, একবার বিপদের সময় তোমার সাহায্য পেয়েছে বলে এবারও বিপদে পড়ে তোমার কথাই মনে হয়েছে ওর। আরো একটা ব্যাপার, ওর জানা নেই যে তুমি আমাদের সাথে জড়িত। আচ্ছা, মেয়েটার সাথে কথাবার্তায় কি বুঝলে?'

'ভেতর ভেতর খুবই উত্তেজিত। ওর বৌদির সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, কি যেন বলতে গিয়েও চেপে গেল। ওর সাথে যেতে রাজি না হওয়ায় আসল ব্যাপারের কিছুই জানতে পারিনি, স্যার।'

'তুমি ফিরিয়ে দিলে কেন?' হাসি হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ। বোঝা যাচ্ছে, সুন্দরী মেয়ের অনুরোধ ঠেলে ফেলায় খুশি হয়েছেন তিনি রানার উপর।

'গোপনে যাব বলে।' গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল রানা।

'তার মানে তুমি যাওয়াই স্থির করেছ?'

'স্থির ঠিক করিনি, স্যার। আপনি কেন ডেকেছেন না

জেনে কিছুই স্থির করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। এখন স্থির করে ফেলেছি।'

'গুড।' হাঁপ ছাড়লেন বৃদ্ধ। 'আমি আরো চিন্তা করছিলাম কিভাবে বলি তোমাকে কথাটা। ভালই হোল। রওনা হয়ে যাও তাহলে। খবর দিয়ে দিচ্ছি, দমদমে গাড়ী থাকবে তোমার জন্যে। ওখানে আসলাম আছে, ওকে প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে পারবে।' ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও আবার থেমে গেলেন। 'কোন প্রশ্ন আছে তোমার?'

'গত ছয়মাস দেবাশীষের গতিবিধি সম্পর্কে কিছু জানা গেছে, স্যার?'

'শুধু জানা গেছে, ঘন ঘন কলকাতায় গিয়েছে সে গত ছয় মাস। কিছুই জানা যায়নি আর।'

'ওর মেসেজটায় ঠিক কি ছিল?'

'জানিয়েছে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে সে, এই তথ্য উদ্ধার করতে গিয়ে প্রাণের আশংকা দেখা দিয়েছে ওর, আমাদের শ্রেষ্ঠ অপারেটারকে যেন পাঠান হয়, আজ রাত সাড়ে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে গ্র্যাণ্ড হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারে যে ছেলেটি থাকবে, তাকে গিয়ে সময় জিজ্ঞেস করতে হবে, ও দশ মিনিট ভুল সময় বলবে, হাত ঘড়িটা মিলিয়ে নেয়ার ছল করে বলতে হবে যে তোমার ঘড়িটা প্রতিদিন দশ মিনিট করে স্লো হচ্ছে গত দশদিন যাবত, ভাল কোন দোকানের ঠিকানা

বলতে পারবে কিনা ও। পরিচয়ের পালা শেষ হলেই ছেলেটি দেবাশীষকে কোথায় পাওয়া যাবে সেই ঠিকানা লিখে দেবে একটা কাগজে। সেই ঠিকানা অনুযায়ী গেলে পাওয়া যাবে ওকে।'

হাসল রানা। এই ছেলেমানুষী ব্যাপার দেখে হঠাৎ মনে হল ওর, স্পাই স্পাই খেলা খেলছে না ত দেবাশীষ? সত্যিই সিরিয়াস কিছু ব্যাপার, না ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে নিজের গুরুত্ব বাড়াচ্ছে লোকটা? সন্দেহ হল, আরো কিছু প্যাঁচ নেই তো? রানা যাতে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয়, সেই জন্যেই ছোট বোনকে পাঠানো হয়নি ত? সত্যিই কি দেবাশীষ জানে না যে রানা বি. সি. আইয়ের লোক?

এসব প্রশ্নের উত্তর জানবার একটিই মাত্র পথ আছে ওর—যেতে হবে।

উঠে দাঁড়াল রানা। মৃদু কণ্ঠে বিদায় নিল মেজর জেনারেলের কাছ থেকে। দ্রুত নির্দেশ দিচ্ছেন তখন তিনি ইন্টারকমে, মাথা নেড়ে আবছা ইংগিতে বিদায় দিলেন রানাকে।

বেরিয়ে গেল রানা ঘর থেকে।

দুই

পাশাপাশি সীটে বসল দুজন।

'শেষকালে মত পরিবর্তন করলেন কেন?' মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করল রিতা।

'মত পাল্টাই নি,' বলল রানা। 'অন্য এক ক্লায়েন্টের কাজে যাচ্ছি।'

'দাদাকে সাহায্য করছেন না তাহলে?' বিস্মিত আয়ত চোখ মেলে ধরল রিতা।

'সময় ও সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই করব,' বলল রানা। 'কিন্তু আমার ক্লায়েন্টের কাজ আগে।' রিতাকে হতাশ হতে দেখে বলল, 'অনেকদিন আগে থেকে কন্ট্রাক্ট রয়েছে কিনা···'

'এক দিনের মধ্যেই পাসপোর্ট ভিসা সব হয়ে গেল?'

'আমার ক্লায়েন্ট খুবই প্রভাবশালী ব্যক্তি। ওঁর পক্ষে এসব আধঘন্টার কাজ।'

'যাকগে, কতদিন লাগবে আপনার এই কাজ শেষ হতে?'

'বড় জোর দু'দিন। তারপর তোমার দাদার বিপদের কথা শোনা যাবে।'

'দু'দিন পর আমাদের আর পাচ্ছেন কোথায়? আমরা ত তখন···' থেমে গেল রিতা।

সিগারেট ধরাল রানা। বলল, 'চলে যাচ্ছো কলকাতা ছেড়ে?'

জবাব দিল না রিতা। সরাসরি প্রশ্ন করল এবার রানা।

'কি ব্যাপার বল ত? কেন এত ভয় পাচ্ছো তোমরা?'

'আপনি যখন কোন সাহায্য করতে পারছেন না, তখন না শোনাই ভাল। তাছাড়া আমি নিজেও সবটা ব্যাপার জানি না। শুধু জানি, যদি পালাতে না পারে তাহলে মারা যাবে দাদা।'

'সাতদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে লিখেছে তোমার দাদা।'

'আমাকেও তাই বলেছে। এর বেশি আমি কিছুই জানি না।'

'তুমি খুলনা থেকে ঢাকায় এসেছিলে কি শুধু আমাকে নেয়ার জন্যেই?'

'না। বৌদির চোখে ধুলো দেয়ার জন্যে।'

একটা ক্রুদ্ধ ভাব ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল রিতার চোখে। অবাক হল রানা। কিন্তু এই পর্যন্ত এসেই একেবারে চুপ হয়ে গেল রিতা, আর কিছুই জানা গেল না

ওর কাছ থেকে। অনেক ভাবে চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল রানা। ঘন্টাখানেক পরেই জানা যাবে সবকিছু, কাজেই কৌতূহল দমন করল সে। কলকাতায় ঠিক কোন ঠিকানায় পাওয়া যাবে ওর দাদাকে সেটাও চেপে গেল রিতা, রানাও জোরাজুরি করল না। রানার সাহায্য পাওয়া যাবে না জেনে চুপ হয়ে গেছে সে একেবারে। বেকায়দা কিছু বলে ফেলে দাদার বিপদের মাত্রা বাড়াতে চায় না।

কাস্টম, ইমিগ্রেশন পেরিয়ে বেরিয়ে এল রানা। পিছু পিছু রিতা। শেষবারের মত হঠাৎ রানার হাত চেপে ধরল রিতা।

'প্লিজ। চলুন আমার সাথে। আজ রাত্রিটুকু থাকুন আমাদের সাথে, কাল না হয় করবেন আপনার ক্লায়েন্টের কাজ ? এক রাতের জন্যে নিশ্চয়ই আপনার সব কাজ নষ্ট হয়ে যাবে না ?'

হাসল রানা। আসলামকে দেখিয়ে বলল, 'ঐ দেখ আমার ক্লায়েন্ট লোক পাঠিয়ে দিয়েছে গাড়ী দিয়ে। গ্র্যাণ্ড হোটেলে যাচ্ছি। তুমিও না হয় চল আমার সাথে, পাঁচ মিনিটের একটা কাজ সেরে যাব তোমার সাথে।'

'কিন্তু আমাকে যে এক্ষুণি যেতে হবে।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও। আধঘণ্টার মধ্যে দেখা করব আমি তোমার সাথে।'

'ঠিকানা কোথায় পাবেন ? কি করে দেখা করবেন আধঘণ্টার মধ্যে ?'

'ভুলে যেয়ো না রিতা, আমি একজন গোয়েন্দা। দারুণ বুদ্ধি আমার মাথায়।' হাসল রানা। 'চলি। আধঘণ্টার মধ্যেই দেখা হবে।'

শিখ ড্রাইভারদের ভিড় ঠেলে চলে গেল রানা। হাঁ করে চেয়ে রইল রিতা ওর গমন পথের দিকে। ঋজু ভংগিতে হেঁটে চলে গেল লোকটা, হাতে একটা ব্রিফ কেস, একটা সবুজ করোনা ডিলাক্সের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোকের সাথে করমর্দন করে উঠে বসল পিছনের সীটে? হুশ করে বেরিয়ে গেল গাড়ীটা।

সম্বিত ফিরে পেয়ে বুঝতে পারল রিতা, ঠাট্টা করেছে মাসুদ রানা ওর সাথে, দেখা করব বলে কেটে পড়ল বেমালুম। অথচ লোকটাকে ও অন্য রকম ভেবেছিল, একাত্তুরের এপ্রিলে সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল লোকটা। একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়ল রিতা। করোনা ডিলাক্স তখন দৃষ্টি পথের বাইরে চলে গেছে।

ঠিক আধঘণ্টা পর পৌঁছল রানা পার্কষ্ট্রীটের বিল্টমোর হোটেলে। গ্র্যাণ্ড হোটেলের মত এখানেও সেই একই রকমের সাবধানতা। দেবাশীষের কথা জিজ্ঞেস করতেই ম্যানেজারের ঘরে নিয়ে আসা হল রানাকে। রানার পাসপোর্ট পরীক্ষা করল ম্যানেজার, ছবির সাথে চেহারা মিলিয়ে দেখল ভাল করে, তারপর দয়া করে চিকণ একফালি

হাসি উপহার দিল রানাকে। পাসপোর্টটা ফেরত দিয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, দেবাশীষ বাবুর অনুরোধেই এই ব্যবস্থা। উনি আছেন পাঁচতালার সাতান্ন নম্বর কামরায়। ওঁর ধারণা, ওঁর প্রাণনাশের আশংকা আছে, তাই এই সাবধানতা।'

'ধন্যবাদ।' বলেই রওনা হল রানা লিফটের দিকে। আসলামকে ইংগিত করল লাউঞ্জে অপেক্ষা করবার জন্যে। ঢুকে পড়ল লিফটের ভিতর।

খোলা দরজা। দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিতা আড়ষ্ট ভংগিতে। রানাকে চিনতে পারল না। ভাবলেশহীন চোখ দুটো চেয়ে রয়েছে রানার মুখের দিকে। শান্তিনিকেতনী কায়দায় কাঁধে ঝুলছে একটা ব্যাগ।

'কি হয়েছে রিতা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

নিজের নামটা শুনে চমকে উঠল রিতা। ভীত চকিত দৃষ্টিতে একবার ঘরের দিকে চেয়েই রানাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করল। খপ করে রিতার একটা হাত ধরে ফেলল রানা। পাগলের মত ধস্তাধস্তি করল রিতা কিছুক্ষণ বন্যজন্তুর মত, তারপর হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। জ্ঞান হারিয়েছে।

ততক্ষণে শোল্ডার হোলষ্টার থেকে বেরিয়ে এসেছে একখানা ওয়ালথার পি পি রানার হাতে। ব্রিফ কেসটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে বাম হাতে জড়িয়ে ধরল রিতাকে,

তারপর সাবধানে পা বাড়াল ঘরের ভিতর।

ব্যালকনিতে ইজিচেয়ারে শুয়ে রাতের আকাশ দেখছে দেবাশীষ। ঘরে আর কেউ নেই। বাথরুমটা পরীক্ষা করে শুইয়ে দিল রানা রিভার জ্ঞানহীন দেহটা বিছানায়। দরজা লাগিয়ে দিয়ে আলো জ্বালল ব্যালকনির।

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মাথার পিছনের ছোট্ট গর্তটা। কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ে আছে মেঝেতে। পয়েন্ট টু ফাইভ ক্যালিবারের কোন পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়েছে দেবাশীষকে পিছন থেকে। ঠিক সেভেন্থ ভার্টেব্রার উপর। মৃত্যু হয়েছে তৎক্ষণাৎ।

দ্রুত হাতে দেবাশীষের কোট ও প্যান্টের পকেট সার্চ করল রানা। টের পেল, ওর আগে আর কেউ সার্চ করেছে। দুটো পকেটের কালো কাপড় বেরিয়ে আছে বাইরে।

টাকা পয়সা খোয়া যায়নি। মানি ব্যাগ, পাসপোর্ট ট্রেনের টিকেট, হাত ঘড়ি, সবই রয়েছে। টাকা পয়সার জন্যে খুন করা হয়নি ওকে।

দেবাশীষের পকেটে যা পাওয়া গেল সব নিজের কোটের পকেটে রেখে ঘরের প্রতিটা জিনিস তন্ন তন্ন করে খুঁজল রানা। কিছুই পাওয়া গেল না। স্যুটকেস খুঁজল। কাপড় চোপড়, কয়েকটা বই, আর কিছু ব্যবসার কাগজপত্র রয়েছে স্যুটকেসে; অস্বাভাবিক কিছুই পাওয়া গেল না।

ফোন করে ডাকল রানা আসলামকে। খাটের কিনারে বসে সিগারেট ধরাল।

লাশ দেখেই আঁৎকে উঠল আসলাম। রানার হাতে পিস্তল, খাটে শুয়ে আছে অপূর্ব সুন্দরী নারী, ব্যালকনিতে লাশ—খুবই সহজ ব্যাপার। বুঝতে হলে বুদ্ধির দরকার পড়ে না।

'গুলির আওয়াজ ত পেলাম না বস্?'

'সাইলেন্সার লাগান ছিল।'

'ঘরে ঢুকেই খতম করে দিলেন?'

একটু অবাক হল রানা, তারপর হাসল। 'হ্যাঁ। মেয়েটাকে পাবার এছাড়া আর কোন পথ ছিল না।'

রিতাকে ভাল করে পরীক্ষা করল এবার আসলাম। আশ্চর্যবোধক শব্দ করল মুখ দিয়ে। 'উফ্! মাই গড! অদ্ভুত সুন্দরী!' হাসল রানার দিকে চেয়ে। 'ঠিক করেছেন ওস্তাদ। আমি হলেও এই-ই করতাম।' লাশটার দিকে চাইল একবার। 'মড়াটাকে নিশ্চয়ই আমার ঘাড়ে ফেলবেন এবার?'

'হ্যাঁ। ওটার ব্যবস্থা করে ফেলুন। ঢাকায় পাঠাতে হবে পোষ্ট মর্টেমের জন্যে। আর এই ঘরের মালপত্র গাড়ীতে তুলে চৌরঙ্গীর ব্রিষ্টল হোটেলে একটা ডাবল-বেড কামরা বুক করে সেখানে পৌঁছে দিন।'

'কি নামে বুক করব?'

'মিষ্টার এ্যাণ্ড মিসেস মাসুদ রানা। মেয়েটার জ্ঞান ফিরলেই ওখানে চলে আসব আমি ওকে নিয়ে। নাউ, বি কুইক!'

'ইয়েস, বস্।'

স্যালুট করে কাজে মন দিল আসলাম। রানা বুঝল, ব্যাটা পাকা ঘোড়েল লোক। দায়িত্ব পালনের অনায়াস দক্ষতা সবার মধ্যে থাকে না। ছেলেটা একটা এ্যাসেট। ওর মত একটা ছেলেকে সহকারী হিসেবে পেয়ে রীতিমত উৎসাহিত বোধ করছে রানা। দশ মিনিটের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেল ঘরটা। রক্তের দাগ পর্যন্ত।

তিন

দেবাশীষের পকেট থেকে নেয়া প্রত্যেকটা জিনিস খুবই যত্নের সাথে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রানা। মানি ব্যাগে রয়েছে ভারতীয় নোটে মোট তিনশো বাইশ টাকা, বাংলা দেশের দুটো একশো টাকার নোট আর আটটা দশ টাকার নোট, একটা দশ পাউণ্ড, এবং সাতটা পাঁচ ডলারের নোট। আর আছে গোটা চারেক ভিজিটিং কার্ড—বিভিন্ন লোকের। কোটের বুক পকেট থেকে পাওয়া একটা রেলের টিকেটের টুকরো অংশ পরীক্ষা করল রানা। বনগাঁ থেকে ভাটপাড়া যাবার ফার্স্ট ক্লাস টিকেট—তারিখটা আজকের। ভাটপাড়া

থেকে খুব সম্ভব বাস বা ট্যাক্সিতে করে কলকাতায় এসেছিল দেবাশীষ।

পাসপোর্টের মধ্যে ছুটো প্লেনের টিকেট পাওয়া গেল। ক্যালক্যাটা টু দিল্লী, আগামী কাল সকালের ফ্লাইট, প্যাসেঞ্জারের নাম মাসুদ রানা এবং রিতা দত্ত। দেবাশীষের টিকেট নেই। এবার পাসপোর্টের এন্ট্রি গুলো দেখল রানা মন দিয়ে। গত ছয়টা মাস প্রত্যেক বুধবার সকালের ট্রেনে কলকাতা এসেছে দেবাশীষ, এবং সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে গিয়েছে বাংলাদেশে। একমাত্র ব্যতিক্রম আজকের দিনটা। আজ মঙ্গল বার। নির্ধারিত নিয়মের একদিন আগেই বনগাঁ পেরিয়েছে সে, কিন্তু বরাবরের মত সোজা কলকাতায় না এসে ভাটপাড়ায় নেমেছিল। গত ছয়টি মাসে এই একটি ব্যতিক্রম।

ভিজিটিং কার্ডগুলো থেকে আরো কিছুটা জানা গেল। কলকাতা ও খুলনার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর নাম ঠিকানা রয়েছে ছয়টা কার্ডে, কিন্তু সপ্তম কার্ডটিতে ভাট-পাড়ার একজন এনগ্রেভারের নাম রয়েছে—নিজামুদ্দিন আহমেদ, বাঁড়ুজ্জে ম্যানসন, ৩২ নং সি, পি, দাশ রোড, ভাটপাড়া। নীচে খুব ছোট টাইপে লেখা আছে—মন-পছন্দ এনগ্রেভিং ও ছাপার কারখানা।

মনে মনে গুছিয়ে নিল রানা তথ্যগুলো। গত ছয়মাস প্রতি সপ্তাহে বুধবার ব্যবসায়িক কাজে কলকাতা এসেছে দেবাশীষ, এবং সেইদিনই ফেরত গেছে খুলনায়। কিন্তু

এবার মঙ্গল বারেই চলে এসেছে সে ভারতে, সরাসরি কলকাতায় না গিয়ে নেমেছে ভাটপাড়ায়। ভাটপাড়ায় কোন একটা প্রয়োজনীয় কাজ সেরে বাস বা ট্যাক্সিতে করে গোপনে এসেছে কলকাতায়। ছোট বোনকে কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করেছে আজই, ঢাকার হেড অফিসে খবর দিয়েছে, আজই যেন ওর কাছ থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়। তার মানে খুব সম্ভব এই রিপোর্টটা সংগ্রহ করেছে সে ভাটপাড়া থেকে। রিপোর্টটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে শত্রুপক্ষ ওটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে খুন পর্যন্ত করতে দ্বিধা করবে না বলে ধারণা হয়েছিল ওর। দেখা যাচ্ছে, ধারণাটা অমূলক নয়। কারো কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবার আগেই, কিম্বা আত্মগোপন করার আগেই খুঁজে বের করে ফেলেছে ওকে শত্রুপক্ষ, পাঠিয়ে দিয়েছে মৃত্যুদূত। দেবাশীষের গোপনীয়তা বা কৌশল কোন সাহায্যে আসেনি ওর।

বেশ। রানার এখন কর্তব্য কি? ঢাকায় ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করবে? নাকি দেবাশীষের রিপোর্ট উদ্ধারের চেষ্টা করবে? এই ব্যাপারের সাথে রিতার কি সম্পর্ক? স্ত্রীকে খুলনায় রেখে এসেছে কেন দেবাশীষ? কেনই বা বোনকে দিল্লী পাঠিয়ে দেয়ার প্ল্যান করেছিল সে? দেবা-শীষের মৃত্যুর পর কি রিতা বিপদমুক্ত? দাদার কার্যকলাপ সম্পর্কে কতদূর জানে রিতা?

হাল্কা করে হাতটা উঠিয়ে রিতার কাঁধ থেকে ব্যাগটা

খসিয়ে এনে বিছনার উপর উপুড় করল রানা। টুকিটাকি অসংখ্য জিনিস ব্যাগে। সকালে রানার অফিসে এই ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ঢুকেছিল রিতা, এয়ারপোর্টেও এই ব্যাগ ছাড়া আর কিছুই লাগেজ ছিল না রিতার—কিন্তু না, হঠাৎ করে বেরিয়ে পড়েনি সে বাড়ী থেকে। সবকিছুই আছে, কিন্তু খুবই সংক্ষিপ্ত। টুথব্রাশ, পেস্ট, সাবান, একটা পাউডারের কৌটো, পাফ, পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রিম, লিপস্টিক, কুমকুম, ছোট একটা শিশিতে জবাকুসুম তেল, এক সেট শাড়ী, পেটিকোট, ব্লাউজ, ব্রা, পাসপোর্ট পার্স—সব আছে। আর একটা মোটা কাভারের গানের খাতা। তার উপর সোনালী অক্ষরে লেখা আছে রিতা দত্ত, নীচে ছোট অক্ষরে—বেতার শিল্পী।

চট করে চাইল রানা রিতার মুখের দিকে। আচ্ছা! এই তাহলে সেই রিতা দত্ত। বাংলাদেশ বেতারের খুলনা সেণ্টার থেকে গান গায়। ওর সম্পর্কে আলোচনা দেখেছিল রানা কোন এক কাগজে। সুকণ্ঠী, সম্ভাবনাময়ী ইত্যাদি প্রচুর বিশেষণ ছিল লেখাটায়। খাতার প্রায় সব পাতাতেই গান লেখা। প্রত্যেকটি গানের নীচে গীতিকার ও সুরকারের নাম লেখা। সারাটা খাতা চাঁদ, সাগর, ফুল, রাত, বাঁশী, পাখী, ভ্রমর, প্রেম, তুমি, আমি আর দখিন হাওয়ায় ভর্তি। ভালবাসায় একেবারে ভাসাভাসি কাণ্ড। রিপাল্‌সিভ! চট করে খাতাটা বন্ধ করে অন্যান্য বাস্তব জিনিসে মন দিল রানা। কিন্তু এই মেয়েলী টুকি-

টাকির মধ্যে তেমন কিছুই আবিষ্কার করতে পারল না যার সাহায্যে দেবাশীষের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু আঁচ করা যায়। পাসপোর্ট দেখে বোঝা গেল, স্বাধীনতার পর এই প্রথম বাংলাদেশের বাইরে এসেছে রিভা। পাস-পোর্ট ইস্যু হয়েছে ঠিক ছয়মাস আগে।

এক এক করে সব জিনিস রেখে দিল রানা ব্যাগের ভিতর যেমন ছিল তেমনি, ব্যাগটা ঝুলিয়ে দিল একটা চেয়ারের কাঁধে। অস্ফুট গোঙানীর আওয়াজ তুলে চোখ মেলল রিতা। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বিছানায়। অবাক চোখে চাইল রানার দিকে, তারপর ঝট করে ফিরল ব্যালকনির ইজিচেয়ারের দিকে।

'কোথায় গেল! কোথায় গেল দাদার······?' থেমে গেল রিতা।

'সরিয়ে ফেলা হয়েছে,' বলল রানা। 'ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

'মারা গেছে! মেরে ফেলেছে দাদাকে, তাই না?'

চেহারটা বিকৃত হয়ে যাচ্ছে রিতার, এক্ষুণি ভেঙে পড়বে কান্নায়। রানা বুঝল, কান্নার সুযোগ দিতে হবে এখন মেয়েটাকে। নইলে ওকে নিয়ে মুশকিলে পড়ে যাবে সে। মাথা নাড়ল।

'হ্যাঁ। মারা গেছে। আমি দুঃখিত।'

প্রচণ্ড এক হাতুড়ির ঘা পড়ল যেন রিতার বুকে। ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল। ফিস ফিস করে বলল, 'নেই! দাদা মরে

গেছে! দাদা নেই!'

ছাতের দিকে চেয়ে শুয়ে আছে রিতা। টপ টপ করে জল ঝরছে দুচোখ বেয়ে। ভায়ের শোকে নীরবে কাঁদছে ছোট বোন। নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরেছে দাঁত দিয়ে, গাল দুটো কুঁচকে আছে, হাত দুটো মুঠি পাকানো—নিঃশব্দে কেঁদে চলেছে।

কারো কষ্ট দেখতে পারে না রানা। কান্না দেখলে ওরও চোখে পানি এসে যায়। তাই অন্যদিকে চেয়ে বসে রইল ও। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ফোঁপানির শব্দ। বোনের হৃদয়ের সীমাহীন যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে এ ঘরের বাতাস। খানিক পায়চারী করল রানা। একবার চট করে রিতার দিকে চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। কাঁদছে এখনো। কাঁদুক। আরো খানিক পায়চারী করে একটা গ্লাসে করে পানি নিয়ে এল বাথরুম থেকে।

'একটু পানি খেয়ে নাও,' বলল রানা। 'কাঁদলে ত চলবে না রিতা, একটু সামলে নিতে হবে, অনেক কাজ আছে আমাদের। এখানে আমরা শত্রুর চোখের সামনে রয়েছি, যে কোন সময়ে আক্রমণ আসতে পারে। আমরা চিনি না ওদের, কিন্তু ওরা আমাদের চেনে। কখন, কোনদিক দিয়ে, কিভাবে আক্রমণ আসবে জানি না আমরা—কাজেই এখান থেকে যত শীঘ্রি সম্ভব সরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নাও, খেয়ে নাও পানিটুকু।'

রানার সব কথা শুনল রিতা, কিন্তু বুঝতে পারল কিনা বোঝা গেল না। ঘাড়ের নীচে হাত দিয়ে খানিকটা উঁচু করল রানা ওকে, গ্লাসটা ধরল ওর ঠোঁটের কাছে। কোনরকম আপত্তি না করে আধগ্লাস পানি খেল রিতা, তারপর সোজা হয়ে উঠে বসে চোখ মুছল আঁচল দিয়ে।

'বাথরুম থেকে চোখ মুখটা ধুয়ে এসো, ভাল লাগবে। যাও, রিতা, ওঠো!'

উঠবার লক্ষণ দেখা গেল না রিতার মধ্যে। চুপচাপ চোখ বন্ধ করে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর চোখ খুলেই প্রশ্ন করল, 'আপনি এখানে এলেন কি করে? পিছু নিয়েছিলেন আমার?'

'না। অন্যভাবে এসেছি। কিন্তু সেসব পরে আলাপ করা যাবে রিতা, এখুনি সরে পড়া উচিত আমাদের। পুলিশের ঝামেলাও হতে পারে।'

'ঝামেলা ত সব শেষই হয়ে গেছে।' বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রিতা। দুই হাতে চোখ ঢেকে রেখেছে, কেঁপে কেঁপে উঠছে সর্বশরীর।

এই অকৃত্রিম, অতলস্পর্শী দুঃখ লাঘব করবার মত সান্ত্বনার একটি কথাও খুঁজে পেল না রানা। দুইবাহু ধরে তুলে দাঁড় করাল রিতাকে, প্রায় জোর করেই নিয়ে গেল ওকে বাথরুমের বেসিনের সামনে। বাচ্চা মেয়েকে যেমন বড়রা মুখ-হাত ধুইয়ে দেয় তেমনি করে রিতার হাত-মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিল।

'ব্যাস। আর কান্না নয়। এবার প্রতিশোধ নিতে হবে আমাদের। যারা তোমার দাদাকে এভাবে হত্যা করল তাদের সর্বনাশ করে ছাড়তে হবে আমাদের। এখন ভেঙে পড়লে চলবে না। চল, বেরিয়ে পড়ি এখান থেকে।'

ব্যাগটা ঝুলিয়ে নিল রিতা কাঁধে। ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও একবার থেমে দাড়িয়ে ব্যালকনির ইজিচেয়ারটা দেখল, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল রানার পিছু পিছু।

প্রথমে কিছুদূর ট্যাক্সি, তারপর কিছুদূর বাস, কিছুদূর ট্রাম, কিছুদূর টানা রিক্সা, এবং কিছুদূর পা-গাড়ী ব্যবহারের পর আবার একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল ওরা চৌরংগীর মোড়ে। লোকজনের ভিড়ে খানিকক্ষণ উল্টোপাল্টা হাঁটার পর ব্রিষ্টল হোটেলের লাউঞ্জে এসে চাবী চাইল রানা। ওদের ঘরে দুজনের খাবার পাঠিয়ে দিতে বলে চলে এল পাঁচ-তালায়।

শোকের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে রিতা।

দেবাশীষের স্যুটকেস দুটো এই ঘরে দেখে অবাক হয়ে চাইল রানার দিকে।

'ওগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে আনিয়েছি এখানে।' কৈফিয়ৎ দিল রানা।

ডাব্‌ল্‌-বেড খাটের দিকে চাইতে দেখে বলল, 'আমি ঐ সোফায় ঘুমাব।'

একটা ব্ল্যাক ডগের বোতল, দুটো গ্লাস, এক বাটি বরফ

আর দু'বোতল পানি নিয়ে ঘরে ঢুকল বেয়ারা। প্রশস্ত ব্যালকনিতে পাতা টেবিলের দিকে ইংগিত করে রানা বলল, 'ওগুলো ঐ টেবিলে রাখ। এক ঘণ্টা পর খাবার নিয়ে আসবে।' দশ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে ধরল বেয়ারার দিকে। 'এক প্যাকেট ইণ্ডিয়া কিং নিয়ে এসো খাবারের সাথে। ভাংতি পয়সা তোমার।'

সালাম জানিয়ে বেরিয়ে গেল বেয়ারা। দরজা লাগিয়ে দিয়ে রিতাকে নিয়ে চলে এল রানা ব্যালকনিতে। দু'জন বসল মুখোমুখি।

'আপনি মদ খান?'

'না। মদ হিসেবে খাই না। ওষুধ মনে করে খাই মাঝে মাঝে।'

'ওষুধ?'

'হ্যাঁ। এ জিনিসের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা দূর করে। স্নায়ুগুলো যখন রাগে, শোকে, ভয়ে বা আশংকায় অতি সচেতন হয়ে ওঠে তখন তাকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে এই ওষুধ বড় উপকারী।' কথা বলতে বলতে দুটো গ্লাসে আউন্স দুয়েক ঢালল রানা, গোটা কয়েক বরফের টুকরো ছাড়ল, আসল জিনিসের দ্বিগুণ পরিমাণ পানি মেশাল, তারপর একটা গ্লাস এগিয়ে দিল রিতার দিকে।

'আমি ওসব খাই না।'

'একান্ত দরকার না পড়লে আমিও খাই না। আজকে

আমাদের দুজনেরই দরকার। নাও, একটু একটু করে খাও, খারাপ লাগবে না।' সিগারেট ধরাল রানা। 'প্রথমে আমাদের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে যাওয়া দরকার। তোমার নিশ্চয়ই কিছু প্রশ্ন আছে আমাকে জিজ্ঞেস করার? আমারও আছে। কাজ শুরু করবার আগে আমাদের দুজনের পরিষ্কার ভাবে জানতে হবে একে অপরের সম্পর্কে। নইলে একসাথে কাজ করা যায় না। প্রথমে আমার প্রশ্নের জবাব দাও, তারপর আমি তোমার প্রশ্নের জবাব দেব।'

'না। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। যে ক্লায়েন্টের কাজে এসেছেন কলকাতায়, তার লোককে একটু আগে নীচের রেস্তোরায় দেখলাম কেন? দাদার লাশটা কিভাবে সরালেন বিল্টমোর হোটেল থেকে? একদিনের মধ্যে আপনার পাসপোর্ট ভিসা হয়ে গেল কি করে? আমি পৌছবার দশ মিনিটের মধ্যে দাদা কোথায় লুকিয়ে আছে সে খবর সংগ্রহ করে আপনি তার গোপন আস্তানায় পৌছলেন কি করে?'

'তুমি মাত্র দশ মিনিট আগে পৌছেছিলে?' একটু অবাক হল রানা। 'তাহলে নিশ্চয়ই প্রথমে অন্য কোথাও গিয়েছিলে, তারপর গিয়েছ তুমি বিল্টমোর হোটেলে?'

হ্যাঁ। একথা আপনি জানলেন কি করে সেটাও আমি জানতে চাই।'

চৈত্রের গরম কেটে গেছে রাত্রির শীতল হাওয়ায়। ঝিরঝিরে মিষ্টি বাতাস বইছে এখন। গ্লাসটা নামিয়ে

রাখল রানা ছোট ছোট দুটো চুমুক দিয়েই। সিগারেটে টান দিল লম্বা করে। পা দুটো লম্বা করে মাথার উপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল। দ্রুত চিন্তা করে স্থির করল ঠিক কতটকু বলা যায় এই মেয়েটিকে।

খুব সংক্ষেপে, যতটা না বললেই নয়, বলল রানা কেন ও কলকাতায় এসেছে, কি করে ঠিকানা পেল ও দেবাশীষের। ব্যাপারটা শুনে হাঁ হয়ে গেল রিতার মুখ। খানিকক্ষণ কোন কথাই বেরোল না ওর মুখ থেকে।

'আপনি সত্যি বলছেন, দাদা আপনাদের লোক ছিল?'

'আমাদের অফিসে চাকরি করত না দেবাশীষ বাবু, কিন্তু মাঝে মাঝে তথ্য সরবরাহ করত। কেন? এত অবাক হচ্ছো কেন তুমি?'

'আপনাদের সাহায্য চেয়েছিল দাদা?'

'নিশ্চয়ই। নইলে আমি আজ এখানে থাকতাম না।'

'তার মানে দাদা বেআইনী কিছু করছিল না?'

এইবার একটু থমকে গেল রানা। বোঝা যাচ্ছে রিতার ধারণা, ওর দাদা বেআইনী কিছু করছিল। ওর ধারণাটা ভেঙে দেয়ার আগে কেন ওর এরকম ধারণা হল সেটা জানা দরকার। কাজেই বলল, 'সেটা হলপ করে বলা যায় না। সবটা শুনলে হয়তো বলতে পারব। নাও, এবার তৈরি হও, এবার আমার প্রশ্নের পালা।'

'জিজ্ঞেস করুন। কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছ থেকে আশা করবেন না। কিছু কিছু ব্যাপার বলতে পারব

না, আর কিছু ব্যাপার আমি সত্যিই জানি না।'

গ্লাসের বাইরে বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে। খানিকক্ষণ সেটা পরীক্ষা করে খেল রিতা প্রথম ঢোক। তেতো লাগায় মুখ বিকৃত করল। আরো একটা ছোট ঢোক খেয়ে নামিয়ে রাখল গ্লাসটা। আধমিনিট চুপচাপ ভাবল রানা, তারপর হঠাৎ চাইল রিতার চোখে।

'যে রিপোর্টটা সংগ্রহ করবার জন্যে হেড-অফিস থেকে আমাকে পাঠান হয়েছে, সেটা পাওয়া যায়নি। তুমি জান কোথায় ওটা?'

'না। রিপোর্টের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। দাদা যে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সাথে কোন ভাবে জড়িত, সেটাও আমার জানা ছিল না।'

'আমি যে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের লোক, সেকথা জানা ছিল?'

'না দাদা বলেছিল আপনি বেসরকারী গোয়েন্দা।'

'তাহলে দেবাশীষ বাবুও জানত না যে আমি সরকারী লোক?'

'খুব সম্ভব না। অন্ততঃ আমার জানা নেই দাদা জানত কিনা।'

'বেশ। এবার অন্য প্রশ্ন। দেবাশীষ বাবুর প্রাণের আশংকা আর রিপোর্ট এই দুটো ব্যাপারকে আলাদা ভাবে দেখতে চাই আমি। ইচ্ছে করলেই উনি আমাদেরকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবার অনুরোধ করতে পারতেন। ওঁর

নিশ্চয়ই জানা ছিল কতখানি ক্ষমতাশালী সংস্থার পক্ষে কাজ করছেন উনি। শুধু একবার এস. ও. এস. পাঠালেই আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতেন আমাদের চীফ ওঁর নিরাপত্তার জন্যে। কিন্তু তা না করে শুধু রিপোর্টটা সংগ্রহ করবার জন্যে একজন সেরা অপারেটারকে পাঠাবার অনুরোধ করেছেন উনি। নিরাপত্তার জন্যে গোপনে বেসরকারী গোয়েন্দা মাসুদ রানার সাহায্য চেয়েছেন। কেন? কি এমন ব্যাপার আছে যেটা উনি গোপন করতে চাইছিলেন আমাদের কাছ থেকে?'

'আমি জানি না।' অন্যদিকে চেয়ে উত্তর দিল রিতা।

'ভবে দেখ, ভুল করে হোক বা জেনে শুনেই হোক উনি আমাকে ডেকেছিলেন সাহায্যের জন্যে। সবটা ব্যাপার আমাকে খুলে বলতেই হত ওঁকে। এবং আমি প্রয়োজন মনে করলে সব কথা জানাতাম হেড-অফিসে। কাজেই আমার কাছে গোপন করবার কোন মানে হয় না। তুমি নিশ্চয়ই জান কে বা কারা ওঁর পিছনে লেগেছিল?'

খানিকক্ষণ গোঁজ হয়ে বসে থেকে বলল রিতা, 'আমি কিছুই জানি না।'

'তোমরা দুজন আলাদা ভাবে রওনা হয়েছিলে কেন? টিকেট দেখে বোঝা যাচ্ছে, দিল্লী চলে যাওয়ার প্ল্যান ছিল। দেবাশীষ বাবুর টিকেটটা কোথায়? আঁচ করতে পারছি, তোমাদের দুজনেরই প্রাণের আশংকা ছিল। কিন্তু এর মধ্যে তোমার বৌদিকে ডাকা হয়নি কেন? তাঁর কি প্রাণের

আশংকা নেই ?’

বৌদির কথায় আবার সেই রাগ ও ঘৃণার ভাবটা ফুটে উঠল রিতার চোখে মুখে। দুই মিনিট অপেক্ষা করেও যখন কোন জবাব এল না, তখন অন্য পথ ধরল রানা।

‘প্রতি বুধবার কি কাজে কলকাতায় এসেছে দেবাশীষ বাবু গত ছয়মাস ? আজকে হঠাৎ ভাটপাড়ায় নেমেছিল কেন ?’

হঠাৎ জ্বলে উঠল রিতা। ‘দেখুন, আমি বলেছি এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না আমি। কেন শুধু শুধু খোঁচাচ্ছেন আমাকে ? আমার কাছ থেকে দাদার বিরুদ্ধে কিছুই জানতে পারবেন না আপনি।’

হাসল রানা। গ্লাস দুটো আবার পূর্ণ করে দিয়ে বলল, ‘দেখ রিতা, তুমি যা ভাবছ, দুনিয়াটা ঠিক তেমন নয়। অন্যরকম। তুমি কি মনে করেছ মুখ বন্ধ রাখলেই সব চাপা পড়ে যাবে ? বি. সি. আইয়ের ক্ষমতা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই তোমার। এই ব্যাপারে থরো ইনভেস্টিগেশন হবে। আমরা চাই না আমাদের দেশের কোন গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক কলকাতায় এসে গুলি খাক। তার ওপর দেবাশীষ বাবু ছিলেন আমাদের লোক। দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলা হবে এর ফলে। এবং,’ কণ্ঠস্বরটা নীচু করল রানা, ‘সমস্ত তথ্য, ভাল মন্দ সব, বেরিয়ে আসবে তখন। আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা হবে এই ব্যাপারে। কিছুই আর রাখা ঢাকা থাকবে না।’

ভয় পেল রিতা। বার কয়েক বোকার মত ঢোক গিলল রানার দিকে চেয়ে। হঠাৎ সামনে ঝুঁকে এসে হাত ধরল সে রানার। 'প্লিজ! এটা বন্ধ করবার ব্যবস্থা করুন।' আকুল অনুনয় ফুটে উঠল রিতার চোখে। 'সবই গেছে আমার। এরপরে দাদার নামে কলংক রটলে যেটুকু আছে তাও যাবে। প্লিজ!' আয়ত দুই চোখে টলটলে পানি।

'এটা ঠেকাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে মন খুলে আমার কাছে সবকিছু বলে ফেলা,' বলল রানা। 'আর কোন উপায় নেই। আমাকে টাকা দিয়ে কেনা যায় না। রমণীর শরীর দিয়ে বশ করা যায় না। আমি যেটা ভাল মনে করব সেটা করবই।' হঠাৎ গলার স্বর পরিবর্তন করল রানা। 'ভয় পাচ্ছ কেন রিতা? সত্যকে স্বীকার করে নেয়ার সাহস নেই কেন তোমার? তুমি যে ভাবে ভাবছ সেভাবে কোন সত্যকে চাপা দেয়া সম্ভব হয় না। বিশেষ করে পাপ কোনদিন ঢেকে রাখা যায় না। তোমার দাদার ব্যাপারে সত্যি কথাটা হয়তো তুমি নিজেও জানো না, সবটা বেরিয়ে আসতে দাও। হয়তো নতুন ভাবে চিনতে পারবে তোমার দাদাকে।'

এসব কথায় কোন-কাজ হল না। ঢক ঢক করে কয়েক ঢোক খেল রিতা গ্লাস থেকে। বলল, 'শুধু একটা ব্যাপারে কথা দিন, দাদার খারাপ দিকটা যতটা সম্ভব চেপে রাখবেন?'

'বেশ। কথা দিলাম। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব, আমি করব।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রিতা। চুপ করে বসে রইল দুই মিনিট। তারপর বলল, 'ঠিকই ধরেছেন। রিপোর্টের সাথে দাদার মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই।'

'কে মেরেছে জান তুমি?

'জানি। বৌদি! বৌদি খুন করেছে দাদাকে!'

চার

দরজায় নক হল।

খাবার দিয়ে গেল বেয়ারা। ব্ল্যাক ডগের কল্যাণে দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে রিতার। রানারও। প্রায় নিঃশব্দে খেয়ে নিল ওরা। খাবার পর কফির সাথে আরো এক পেগ ওষুধ খাওয়াল রানা রিতাকে। এর ফলে ঘুমাতে পারবে রিতা। রানা জানে, এক ঘুম দিয়ে উঠলেই অনেকটা সুস্থ হয়ে যাবে রিতা, দাদার মৃত্যুটাকে বহু দূরের অতীত বলে মনে হবে। যত দ্রুত সম্ভব ভাইয়ের মৃত্যুর শোকটা কাটিয়ে ওঠা দরকার এখন ওর। বিপদ আর ভয়ের রাজ্যে আছে ওরা এখন, এর সাথে যদি প্রিয়জনের মৃত্যুর শোক যুক্ত হয়, তাহলে সামলে ওঠা অসম্ভব হয়ে পড়বে রিতার পক্ষে।

এঁটো বাসন আর বখশিশ নিয়ে বেয়ারা বিদায় হতেই আবার এসে বসল ওরা ব্যালকনিতে। সিগারেট ধরাল রানা।

'তোমার বৌদিই খুন করেছে তাহলে?'

'নিজে হাতে করেনি, কিন্তু ঐ একই হল। বৌদির জন্যেই খুন হয়েছে দাদা।'

'একটু খুলে বল।'

'এগারো বছর আগে ভালবেসে বিয়ে করেছিল দাদা বৌদিকে। বিরাট বড়লোকের মেয়ে। আমার তখন নয় বছর। আমরা বড়লোক ছিলাম না। সংসারে শুধু মা, দাদা আর আমি, তাই আমাদের বেশ ভালই চলে যেত দাদার উপার্জনে। মা মারা গেলেন বিয়ের বছরই।

'বিয়ের পর বছর দুয়েক খুবই সুখে শান্তিতে কাটল। কিন্তু তারপর থেকেই শুরু হল গোলমাল। তখন ভাল করে বুঝতাম না, কিন্তু এখন বুঝি, গোলমালটা বেধেছিল বাচ্চা হওয়া নিয়ে। বৌদির ধারণা হয়েছিল দাদার শারীরিক কোন ত্রুটির জন্যে মা হতে পারছেন না তিনি। ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেল যে দাদা ঠিকই আছে, দোষ বৌদির, উনি কোনদিন মা হতে পারবেন না। কিন্তু একথা কিছুতেই বিশ্বাস করান গেল না তাঁকে। তাঁর ধারণা, দাদা নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে ডাক্তারকে ঘুষ দিয়ে এই কথা বলিয়েছে। দাদা বলল, ঠিক আছে, ঢাকায় চল, তোমার যাকে খুশি তাকে দিয়ে দেখাও। কিন্তু তাতেও

তিনি রাজি না। তাঁর ধারণা সেখানেও টাকা দিয়ে হাত করবে দাদা ডাক্তারকে। ডাক্তারের কাছে কিছুতেই যাবেন না তিনি।

সেইসব দিনের কথা পরিষ্কার মনে আছে আমার। কী আশ্চর্য ধৈর্যের সাথে বোঝাবার চেষ্টা করত দাদা, কত ভাবে অনুনয় বিনয় করত মাথা থেকে কুচিন্তা দূর করবার জন্যে।'

'কুচিন্তা মানে?'

'বৌদি জানিয়ে দিয়েছিল যে দাদার মত অক্ষম এবং নীচ মনোবৃত্তির লোকের কাছে চিরকাল নিঃসন্তান হয়ে কিছুতেই থাকবে না, প্র্যাটিকাল এক্সপেরিমেন্ট করে দেখবে। যদি দেখা যায় গর্ভধারণের ক্ষমতা আছে তার, তাহলে দাদাকে ডিভোর্স করে সেই লোককে বিয়ে করবে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রিতা। 'এরপর আর শান্তি ফিরে আসেনি সংসারে। গুম হয়ে গেল দাদা। বিয়ের বছরই চাকরী ছেড়ে ব্যবসায়ে ঢুকেছিল দাদা, ব্যবসা ফুলে ফেঁপে বিরাট হয়ে যাওয়ায় ব্যস্ত থাকতে হত ওকে ওদিকেই বেশি, আর এদিকে একের পর এক পুরুষ বন্ধু সংগ্রহ করে এক্সপেরিমেন্ট চালাতে থাকল বৌদি।'

'তোমার দাদা কিছুই বলল না?'

'আমিও তাই ভাবি, কেন কিছু বলল না দাদা? হয়তো ভেবেছিল নিজের অক্ষমতার কথা টের পেয়ে আবার ফিরে আসবে বৌদি তার কাছে মাথা হেঁট করে, হয়তো আবার সেই সুখ শান্তি ফিরে আসবে ভেবে অপেক্ষা করেছিল

দাদা। কিন্তু বৌদি আর ফিরল না। ভেসে গেল বানের জলে।'

'রাগও করত না তোমার দাদা?'

'না। দাদাকে শুধু একবার রাগ করতে দেখেছি আমি জীবনে। কথাটা মনে আছে, কারণ আমার জীবনে একটা মস্ত বড় ঘটনা ঘটেছিল তার আগের দিন তিন বছর আগের ঘটনা। দুপুরে বাড়ী ফিরে ভাত খাচ্ছিল দাদা, কি কথা বলল বৌদি জানি না, ভয়ানক রেগে উঠে জঘন্য গালাগালি করল দাদা বৌদিকে, লাথি মেরে ভাতের থালা ফেলে দিয়ে খাবার ঘরের সমস্ত কাপ তস্তরী ভেঙে চুরমার করে দিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। সেই সময় অতিরিক্ত মদ খেতে শুরু করেছিল দাদা, খুব সম্ভব মাতলামীতে চেপেছিল সেদিন। কিন্তু সন্ধ্যের সময় আগের মতই শান্ত ধীর পায়ে ঘরে ফিরল দাদা। তবে আমি জানি, সেদিনের পর থেকে বৌদির প্রতি সমস্ত আকর্ষণ হারিয়েছিল দাদা।'

রানাকে অস্থির হয়ে উঠতে দেখে বলল রিতা, 'এইবারেই আসল কথায় আসছি। হঠাৎ দাদার ব্যবসা ফেল পড়ল। টাকা পয়সার টানাটানি দেখা দিল সংসারে। তার কয়েক মাস পরেই শুরু হয়ে গেল মুক্তি যুদ্ধ। আমরা চলে গেলাম কলকাতায়। পথে আপনি সাহায্য করেছিলেন, মনে আছে নিশ্চয়ই।

'সেই নয়টা মাস কলকাতায় যা খুশি তাই করেছে বৌদি। আগে তাও আড়ালে আবডালে লুকিয়ে করত,

এবার একেবারে খোলাখুলি, সবাইকে দেখিয়ে। এত প্রেমিক জুটে গেল যে কে কখন বৌদিকে নিয়ে বাইরে যাবে তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত হত ওদের।'

'আর তোমার দাদা?'

'গুম হয়ে বসে থাকত ঘরের কোণে। মাঝে মাঝে দেখতাম বালিশ বুকে চেপে গড়াগড়ি করে কাঁদছে। আমি এক-আধদিন সহ্য করতে না পেরে ছুটে চলে গিয়েছি দাদার ঘরে, বলেছি এর একটা বিহিত কর, নির্জীবের মত কেন সহ্য করছ। দাদা বলেছে, সময় হয়নি এখনো। তুমি তোমার ছোট্ট মাথাটা পড়াশোনা আর গানের পিছনে ঘামাও গিয়ে?

'দেশ স্বাধীন হল, ফিরে এলাম আমরা খুলনায়। দাদার গুদাম কিছু লুট করেছে, বাকিটা পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু দেখলাম, খুব অল্পদিনেই গুছিয়ে নিল দাদা। যদিও অনটন চলতেই থাকল, আমার জন্যে টাকা খরচ করতে কোনদিন দ্বিধা দেখিনি দাদার মধ্যে। আমি হোস্টেলে থাকতাম, সেই হোস্টেলে দুই হাজার টাকা দামের স্কেল-চেঞ্জ হারমোনিয়াম, সাতশো টাকার তানপুরা, আড়াইশো টাকার তবলা কিনে দিয়েছে দাদা কমোন রূমের জন্যে। আমি বকেছি দাদাকে, এত টানাটানির মধ্যে এত খরচ কেন করতে গেল, রহস্যময় হাসি হেসেছে দাদা। বলেছে, তোর বৌদিকে বলিস না।

'খুলনার কিছু পুরোন প্রেমিক, আর কলকাতার কিছু

নতুন প্রেমিক ঘন ঘন যাওয়া আসা করতে থাকল আমাদের বাসায়। শুরু হল খোলাখুলি গল্প গুজব, হৈ-হট্টোগোল। একবার ছুটিতে বাড়ী এসে দেখলাম ভীষণ ঝগড়া চলেছে দাদা বৌদির মধ্যে। বাইরে থেকে খুব একটা কিছু প্রকাশ পেত না, কিন্তু আমি টের পেলাম ভয়ানক মন কষাকষির যুদ্ধ চলেছে তাদের মধ্যে। দাদাকে দিয়ে কিছু একটা করাতে চায় বৌদি, দাদা কিছুতেই করবে না।'

'কি সেই জিনিস বলতে পারবে?'

'না। আমি অনেক জিজ্ঞেস করেও জবাব পাইনি দাদার কাছে। কাজটা নতুন প্রেমিকদের কারো সাথে কোন বিশেষ ব্যবসা সংক্রান্ত যতদূর সম্ভব। সংসারে অভাব, রোজগার করতে পারে না, ইত্যাদি টুকরো টুকরো কথা কানে গেছে আমার। দশদিন যুদ্ধের পর আত্মসমর্পণ করল দাদা। রাজি হল বৌদির প্রস্তাবে।'

'কতদিন আগের ঘটনা এটা।'

'ছয় মাস মত হবে।'

'তারপর?

'বিশ্বাস করুন, দাদাকে রাজি হতে বাধ্য করেছিল বৌদি। ঝগড়া করে, খোঁটা দিয়ে, যত ভাবে পারে সব রকমের কৌশল খাটিয়ে রাজি করেছিল। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে শেষ কালে রাজি হল দাদা মোটা টাকার বিনিময়ে, ঝগড়া থেমে গেল, বেশির ভাগ লোকই আসা যাওয়া বন্ধ করে দিল আমাদের বাসায়, দাদা প্রতি বুধবার

কলকাতায় যাওয়া শুরু করল।'

'এই সময়টায় কি পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ?'

'দাদার মুখের মিষ্টি হাসি অদৃশ্য হয়ে গেল চিরতরে। কিন্তু প্রচুর টাকা পয়সা আসতে শুরু করল সংসারে। কিন্তু দাদা বৌদির সম্পর্কের কোন উন্নতি হয়নি এর ফলে।'

'বৌদির প্রেমিকেরা সবাই হিন্দু?'

'না। শুনলে অবাক হবেন, দাড়িওয়ালা মৌলবীও ছিল তাদের মধ্যে। জনা তিনেক হিন্দু ছিল, বাকি সবাই মুসলমান।'

'ঠিক কি কাজ করছিল তোমার দাদা বৌদির প্রেমিকের হয়ে কিছুই আঁচ করতে পারনি তুমি? একেবারে কিছুই না?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল রিতা, 'শুধু জানি, কাজটা বেআইনী ছিল। সৎ কোন কাজ নয়।' মাথাটা নীচু করল রিতা। 'বহুবার জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু উত্তর পাইনি।'

'গোটা কয়েক নাম বল দেখি? শেষের দিকে যারা যেত তোমাদের বাসায় তাদের নাম।'

'মোটা একটা মাড়োয়াড়ী যেত, নাম—বনোয়ারী লাল কি যেন, ওর স্ত্রীর মাধ্যমে পরিচিত হয়েছিল বৌদির সাথে কলকাতা থেকে চলে আসবার কিছুদিন আগে। আরেকজন ছিল ইজ্জত আলী, খুলনার লোক, রাজেশ মল্লিকের সাথে তুমুল মারামারি হয়েছিল ওর আমাদের বাড়ীর উঠোনে দিন

পনের আগে।'

'রাজেশ মল্লিকটা কে ?'

'আমাদের প্রতিবেশী। মাস আষ্টেক আগে আমাদের পাশের বাসাটা ভাড়া নিয়ে চলে এসেছে আমাদের পাড়ায়। একা থাকত। বৌদি যেত ওর ঘরে। মারামারির পর আর দেখিনি ওকে। ইজ্জত আলীও আসা বন্ধ করে দিয়েছিল।'

'আর কোন নাম ?'

'আর নাম মনে পড়ছে না। চেহারা দেখলে চিনতে পারব। ওদের এত ঘৃণা করতাম যে নাম জানবার আগ্রহ হয়নি কোনদিন।' হাই তুলল রিতা।

'তোমার দাদার সাথে শেষ দেখা হয়েছিল কবে ? কি কি কথাবার্তা হয়েছিল তোমাদের মধ্যে ?'

'গত পরশু। অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হল দাদাকে। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল আমার ঘরে, জিজ্ঞেস করল বৌদি কোথায় গেছে, কখন আসবে। বাড়ীতে নেই শুনে বসল দাদা আমার খাটে।' কথা বলতে বলতে চোখ বুঁজে এল রিতার। 'বলল, অবস্থা নাকি খুব খারাপ হয়ে গেছে। আমাদের জন্যে খুলনায় থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। খুলনার জীবন শেষ করে ঢাকায় চলে যাব আমরা, নতুন ভাবে শুরু করব আমাদের জীবন। বৌদির কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেছিল, ওকে নেব না। খালি তুই আর আমি। শেষ পর্যন্ত বৌদির ব্যাপারে দাদা একটা কিছু

সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছে দেখে আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম। দাদা বলল, আমাকে ঢাকায় যেতে হবে, আপনাকে খুঁজে বের করে যেমন করে হোক আপনাকে নি:য় কলকাতায় পৌঁছতে হবে। ওখান থেকে আমরা চলে যাব দিল্লী। সাতদিন লুকিয়ে থাকলেই চলবে, ততদিনে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন আমরা ঢাকায় ফিরে গিয়ে ওখানেই সেট্‌ল্‌ করব।'

টপটপ করে গাল বেয়ে পানি পড়তে শুরু করল আবার। সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার আগেই চট করে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তোমার দাদাকে তোমার বৌদি খুন করেছে, একথা বলেছিলে কেন?'

'ঐ পিচাশিনীই বাধ্য করেছিল দাদাকে কুসংসর্গে পড়ে বেআইনী কাজ করতে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে নামিয়েছিল দাদাকে খারাপ পথে। যখন ওদের কবল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল দাদা, তখন...তখন...' থেমে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল রিতা, তারপর ধরা গলায় বলল, 'জানেন, সব কিছুর জন্যে দায়ী ঐ মেয়েমানুষটা। দাদার মত ভাল মানুষ হয় না। সত্যি বলছি, কোন পাপ স্পর্শ করতে পারত না তাকে, সেই দেবতার মত দাদাকে...আমার আর কেউ নেই...কেউ থাকল না...'

কান্নায় ভেঙে পড়ল রিতা। দুই হাতে চোখ চেপে ধরে হু হু করে কাঁদল কিছুক্ষণ। ওর মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে দিল রানা। কান্নার বেগ কিছুটা কমে আসলে পর হাত

ধরে নিয়ে এল খাটের কাছে।

'শুয়ে পড়ো, রিতা। আমি নীচে থেকে দু'একটা কাজ সেরে আসছি।' চট করে রানার হাত ধরে ফেলল রিতা। রানা বলল, 'ভয় নেই। এখানে কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। দশ মিনিটেই ফিরে আসব। শুধু একটা প্রশ্নের জবাব দাও। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে প্রথমে কোথায় গিয়েছিলে?'

'শ্যামবাজার। দাদা বলে দিয়েছিল, ওখানে আনন্দ ক্লথ মার্চেন্টের ম্যানেজারকে আমার পাসপোর্ট দেখালে উনি আমাকে আমার একটা পরিচিত খাতা দেবেন, সেই খাতার একাত্তুর পৃষ্ঠায় লেখা থাকবে দাদার ঠিকানা। সেইভাবেই পৌঁছেছিলাম। কিন্তু গিয়ে দেখলাম··'

'ঠিক আছে। এবার তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়। আমার জন্যে একটা বালিশ রেখে দিয়ো ঐ সোফার ওপর, তাহলেই হবে। বাইরে থেকে চাবী লাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, তোমার আর ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলতে হবে না।'

নীচে নেমে এল রানা। লাউঞ্জের অন্ধকার মত এলাকায় এক বোতল বিয়ার নিয়ে বসে বসে ঝিমোচ্ছে আসলাম। রানাকে দেখে জ্যান্ত হয়ে উঠল।

'ইয়েস বস্। আফোনার ঝন্য খি খরিতে ফারি?'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসলামের কর্তব্য বুঝিয়ে দিল রানা। সব শেষে বলল, 'কাল বিকেল চারটের মধ্যে এই সব প্রশ্নের উত্তর চাই আমি। আর শুনুন, বনোয়ারী লাল

নামে যে কয়জন মাড়োয়াড়ী বড় বড় ব্যবসায়ী আছে কলকাতায়, তাদের একটা লিস্ট দরকার আমার। এছাড়া রাজেশ মল্লিক নামে একজন লোকের সংবাদও দরকার।'

'আর কিছু দরকার?'

'আর কাজ দিলে ত কাপড় খারাপ করে ফেলবেন।'

'ফেলেছি, অলরেডি। কিন্তু কাল কি গাড়ীতে যাবেন ভাটপাড়ায়?'

'হ্যাঁ। অসুবিধে আছে?'

'না। কোন অসুবিধে নেই বস্। তাহলে সকালে ওটাকে ভালমত টিউন করিয়ে রাখব। এই কেসটায় শেষ পর্যন্ত আপনার সাথে কাজ করবার সুযোগ পাব ত ওস্তাদ?'

'পাবেন। যদি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেন। ইট লুক্স্ ভেরি টাফ্।'

'ও. কে. বস্। থ্যাংকিউ। রাত্রিটা টিকে থাকতে পারলে দেখা হবে কাল। চলি।'

বিল চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল আসলাম আহমেদ। রানা গিয়ে দাঁড়াল রিসেপশন কাউন্টারের সামনে। ঢাকায় একটা খবর দিতে হবে।

লাইন পেতেই দশ মিনিট দেরি হয়ে গেল। সংক্ষেপে সবটা ব্যাপার জানিয়ে এবং কিছু নির্দেশ দিয়ে ফিরে এল রানা পাঁচতালায় ওদের কামরার সামনে। থমকে দাঁড়াল হাসির শব্দে। অশ্লীল একটুকরো হাসি। পুরুষ কণ্ঠে।

নিঃশব্দে চাবী ঘুরাল রানা, আস্তে ঠেলা দিল দরজায়।

ভিতর থেকে বল্ট্ লাগান। চাবীর ফুটোয় চোখ রেখে দেখতে পেল খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রিতার কাপড় খুলছে একজন লোক। কয়েক পা পিছিয়ে এসে প্রচণ্ড জোরে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল রানা দরজার গায়ে। ঘরের ভিতর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। দ্বিতীয় ধাক্কাতেও খুলল না দরজা। ভিতরের একটা কপাট বা জানালা বন্ধ হল সজোরে। তৃতীয় ধাক্কায় হুড়মুড় করে ঘরের ভিতর গিয়ে পড়ল রানা।

ব্যালকনির দরজাটা একপাট খোলা, ঘরের ভিতর কোন নড়াচড়া নেই। বিছানার উপর চিত হয়ে শুয়ে আছে রিতা, নিঃসাড়। এক ছুটে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল রানা। পরমুহূর্তে বুঝতে পারল কত সহজে এক কামরার ব্যালকনি থেকে অন্য ব্যালকনিতে যাওয়া যায়। আশে পাশের ঘরে খুঁজে কোন লাভ নেই। পালিয়েছে।

বাথরুমটা পরীক্ষা করে দেখল রানা। কেউ নেই সেখানে। ফিরে এল খাটের পাশে। শাড়ী ব্লাউজ ছেঁড়া, বুকে খামচির দাগ, উলঙ্গ, অজ্ঞান। গাল বেয়ে রক্ত ঝরছে রিতার। বেঁচে আছে।

ছুটে গিয়ে বাথরুম থেকে তোয়ালে ভিজিয়ে আনল রানা, মুছতে শুরু করল। মাথার ডান পাশে খানিকটা চামড়া চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেছে গুলিটা। পিছন দিকে পাওয়া গেল আরেকটা ক্ষত চিহ্ন, শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে ওখানে। দুটো ক্ষত থেকেই প্রচুর রক্ত ঝরে

ভিজিয়ে দিয়েছে বালিশ, চাদর। থকথকে রক্তে চাপ ধরে গেছে চুলে।

বেয়ারার জন্যে বেল টিপে দিয়ে আবার রক্ত পরিষ্কারে মন দিল রানা। মৃদু গোঙানীর শব্দ বেরোল রিতার মুখ থেকে, পাশ ফিরে শুলো।

আয়োডিন, এ্যাসপিরিন, তুলো আর ইলাস্টোপ্লাস্ট কিনে আনবার জন্যে টাকা দিল রানা বেয়ারাকে।

দশ মিনিটের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে এল রিতার আয়োডিনের জ্বালায়। ক্ষতগুলোর উপর থেকে চুল সরিয়ে ইলাস্টোপ্লাস্ট লাগিয়ে দিল রানা, আধগ্লাস ব্ল্যাক ডগের সাথে গোটা চারেক এ্যাসপিরিন গিলে ফেলতে বাধ্য করল ওকে। কিছুটা ধাতস্থ হবার সাথে সাথেই দ্রুত হাতে শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ ঢাকবার চেষ্টা দেখে বুঝল, আর ভয়ের কিছুই নেই। মৃদু হেসে ঘরের চারিপাশে চোখ বুলাল সে।

মনে হচ্ছে কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেছে ঘরের মধ্যে। স্যুটকেসের সমস্ত জিনিস কার্পেটের উপর ছড়ান, ব্রিফকেসের সমস্ত জিনিস নামানো হয়েছে টেবিলের উপর, রিতার ব্যাগের যাবতীয় জিনিস ঢালা হয়েছে মেঝেতে, পাগলের মত কিছু একটা জিনিস খুঁজেছে লোকটা ত্রস্ত হাতে। যেখানে যা ছিল সেইমত তুলে রাখল রানা। লক্ষ্য করল, কিছুই খোয়া যায়নি। বাথরুমের চৌকাঠ থেকে ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে একটুকরো সীসা বের করল সে।

পয়েণ্ট টু ফাইভ ক্যালিবারের বুলেট।

অর্থাৎ পিছু ছাড়েনি শত্রুপক্ষ। চোখে চোখেই রেখেছে ওদের।

আরো একটি কথা পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা। যেজন্যে হত্যা করা হয়েছে দেবাশীষকে, তন্ন তন্ন করে যা খুঁজছে ওরা দেবাশীষের মালপত্রের মধ্যে, সেটা পায়নি ওরা। রানার ব্রিফকেসটাও বাদ দেয়নি ওরা খুঁজতে গিয়ে। ছোটখাট কোন জিনিস খুঁজছে ওরা। কি সেই জিনিস?

'ব্যাগ থেকে শাড়ী ব্লাউসটা একটু দেবেন?' বলল রিতা।

বিনা বাক্য ব্যয়ে ওগুলো ছুঁড়ে দিল রানা খাটের উপর। বাথরুমে চলে গেল রিতা। একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানল রানা কিছুক্ষণ, তারপর কাপড় ছাড়তে শুরু করল।

রিতা যখন বেরোল, রানা তখন শুয়ে পড়েছে সোফায়। কনুইয়ে ভর দিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে কাৎ হয়ে শুয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছে সে, বাম হাতে পুড়ছে সিগারেট। খাটের ধারে বসল রিতা। চোখ মেলল রানা।

'কি হয়েছিল?'

'আপনি বেরিয়ে যাবার খানিক পরে বাতি নিভিয়ে দিয়ে খাটে উঠতে যাব, এমনি সময় মাথার পেছনে কি যেন এসে লাগল খুব জোরে। হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম।'

'জ্ঞান হারালে?'

'না। ঐ লোকটা প্রথমে তাই মনে করেছিল। আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু জ্ঞান হারাইনি। কয়েক

মিনিট পর ঘোরটা কেটে যেতেই যখন বুঝলাম এই লোকটাই দাদার হত্যাকারী···'

'কি করে বুঝলে?'

'কি যেন খুঁজছিল লোকটা আমাদের জিনিসপত্রের মধ্যে। বিল্টমোর হোটেলেও দাদার সমস্ত জিনিস···'

'তুমি ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিলে ওর ওপর?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আয়নায় আমাকে নড়ে উঠতে দেখেই ঝট করে ঘুরে ওই ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।'

'ওর চেহারাটা দেখতে পেয়েছ?'

'শুধু চোখদুটো দেখতে পেয়েছি। বাকিটুকু রুমাল দিয়ে বেঁধে নিয়েছিল।'

'গুলি করল কেন?'

'কয়েক ঘুষি মেরে আমাকে কাবু করেই দূরে সরে গেল লোকটা। তারপর পিস্তল বের করে গুলি করল। ঐ গুলিতেই জ্ঞান হারিয়েছিলাম আমি। আমি ভেবেছিলাম মরে গেছি। লোকটা কখন আমার কাপড় জামা ছিঁড়ল জানি না।'

'প্রথমে সমস্ত জিনিসপত্র সার্চ করেছে লোকটা। যখন পেল না যা চায়, তখন শুধু হাতে না ফিরে কিছু আনন্দ আহরণ করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। বেচারার কপাল খারাপ, আমি এসে পড়ায় রিক্ত হাতেই ফিরতে হল ওকে।'

চুপচাপ কার্পেটের দিকে চেয়ে বসে রইল রিতা। রানা বলল, 'শুয়ে পড়। আর কোন ভয় নেই। আমারই ভুল

হয়েছিল। ওদের অনেক আণ্ডার-এস্টিমেট করেছিলাম আমি। তোমার ওপরেও যে বিপদ নেমে আসতে পারে একথা কল্পনাতেও আসেনি আমার। আর ভুল হবে না। লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুমিয়ে পড়। আমি জেগে থাকব বাকি রাত।'

'কি হচ্ছে এসব ? কেন হচ্ছে ? কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমি।' বাচ্চা মেয়ের মত বলল রিতা।

'আমিও না।' বলল রানা। 'তবে শীগ্‌গিরই বুঝতে পারব।'

শুয়ে পড়ল রিতা।

নিয়ন সাইনের ঝলকানি দিন করে রেখেছে চৌরঙ্গীর রাতকে।

একা জেগে বসে রইল রানা।

পাঁচ

'হাসছেন কেন?' হঠাৎ পাশ ফিরে প্রশ্ন করল রিতা।

গড়পড়তা চল্লিশ মাইল স্পীডে চালাচ্ছে আসলাম ওর করোনা ডিলাক্স। ব্যারাকপুর ট্রাংক রোড ধরে চলেছে ওরা ভাটপাড়ার দিকে। গত রাতের দু'একটা কথা মনে পড়ায় হাসছিল রানা আপন মনে, ধরে ফেলেছে রিতা।

'বলতেই হবে। সেই সকাল থেকে দেখছি লুকিয়ে লুকিয়ে হাসছেন।'

সারা রাত জেগে বসেছিল রানা কাল ব্রিষ্টল হোটেলের পাঁচ তালায়। অকাতরে ঘুমিয়েছে রিতা। ঘুমের মধ্যে কথা বলে মেয়েটা। বার কয়েক কেঁদে উঠেছে ও ঘুমের ঘোরে, আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভোর রাতের দিকে হঠাৎ হেসে উঠল খিল খিল করে। বলল, যাঃ, লজ্জা করছে—দেখে ফেলেছেন আপনি আমার সব। খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর বলল, আমিও। দুই বছর আগে। যেদিন তিনজন পাক-সেনার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, সেইদিন। একটু চুপ করে থেকে বলল, ইশ, আমি বুঝি সেই ছোট্ট মেয়েটাই আছি? আবার পাশ ফিরল রিতা,

বিড়বিড় করে বলল, তোমাকে পাব না আমি জানি, রানা।

কার সাথে স্বপ্নের ঘোরে কথা হচ্ছিল বুঝতে অসুবিধে হয়নি রানার। একটা মেয়ের স্বপ্নের মধ্যে ওর নিজের ভূমিকাটা যতবার মনে পড়ছে ততবারই হাসি আসছে রানার। ওর নিজের সংলাপগুলো শুনতে পায়নি রানা, ঠিক কি কথা বলিয়েছে ওর মুখ থেকে রিতা, বলবার সময় কেমন দেখাচ্ছিল ওকে, চিন্তা করতে বেশ মজাই লাগছিল রানার। সিনেমার মত যদি রিতার স্বপ্নটা দেখা যেত তাহলে বড় ভাল হত। আচ্ছা, রিতার কল্পনায় রানা যখন প্রেম নিবেদন করছে, তখন কি কাপড় পরনে ছিল ওর? ঘটনাস্থলটা কোথায়? রাত না দিন? তুমি পর্যন্ত নেমেছিল যখন, নিরালা কোন জায়গাই হবে……

'কই? বলছেন না যে? কেন হাসছেন?'

'ঘুমের ঘোরে খুব নাক ডেকেছ তুমি, তাই।'

'যাঃ, অসম্ভব! কোনদিন নাক ডাকে না আমার। মিথ্যে কথা।'

'কি করে বুঝলে?' হাসল রানা, 'তুমি ত ঘুমিয়ে ছিলে।'

'ঘুমালে কি হবে? নাক ডাকে না আমার। ডাকলে হোস্টেলের বান্ধবীরা বলত না বুঝি? তাছাড়া আমি মোটা নাকি যে নাক ডাকবে? অসম্ভব। অন্য কিছু ব্যাপার, চেপে যাচ্ছেন। সত্যি বলেন তো, নাক ডেকেছিল?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না।'

'তাহলে? হাসছেন কেন?'

'স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছিলে তুমি। সব শুনেছি।'

'কি কথা...' বলতে গিয়েই হঠাৎ জিভ কাটল রিতা। মনে পড়ে গেছে ওর স্বপ্নটা। গোলাপী হয়ে উঠল রিতার ফর্সা গাল। দুই হাতে চোখ ঢাকল, তারপর ঝট করে ওপাশ ফিরল একগুচ্ছ চুল রেশমী পরশ বুলিয়ে দিল রানার গালে।

সিগারেট ধরাল রানা। জানালার ধারে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে রিতা। মাঝে মাঝে মৃদু হাসি খেলে যাচ্ছে ঠোঁটের কোণে। হাঁপ ছাড়ল রানা। যাক, অনেকক্ষণ শোক ভুলে থাকবার খোরাক পেয়েছে মেয়েটা। বিষাদময় অতীতকে যতটা ভুলে থাকতে পারা যায় ততই মংগল।

'আসলাম কথা বলছেন না যে?'

'বলতে দিচ্ছেন কই, ওস্তাদ? চান্সই ত দিচ্ছেন না। নিজেরাই মশগুল। আমি যেন শালার একটা কুত্তার বাচ্চা।'

'নিন, এইবার ফাঁকা ময়দান ছেড়ে দিলাম আপনাকে। ঝেড়ে ফেলুন যা আছে পেটে।'

একটা সিগারেট এগিয়ে দিতেই একগাল হাসল আসলাম, থ্যাংকিউ বলেই খপ করে প্রায় কেড়ে নিল সিগারেটটা। রানা বুঝল, সম্মান দেখাতে গিয়ে এতক্ষণ সিগারেট খাচ্ছিল না ছোঁড়াটা ওর সামনে। অফার করতেই লুফে নিয়েছে সুযোগটা।

এক বুক ধোঁয়া টেনে ভুশ করে ছাড়ল আসলাম। বলল, 'বাঁচলাম। পেট ফুলে মরার জোগাড় হয়েছিল একেবারে। তারপর যা বলছিলাম, বস্, গুলিটা পয়েন্ট টু ফাইভ ক্যালিবারের। কন্‌ফার্মড্। রাজেশ মল্লিক সম্পর্কে শুধু এইটুকুই জানা গেছে যে সে একসময় ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের লোক ছিল। আর বনোয়ারী লাল পাওয়া গেছে ছয়টা। এই যে লিষ্ট।' পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে দিল আসলাম। 'এদের মধ্যে ঝুনঝুনওয়ালাটার ওপর ভারত সরকারের চোখ আছে। লোকটা মস্ত ক্রুক, গ্যাং-মাষ্টার। নেক্স্ট, বনগাঁ এবং বেনাপোলের কাষ্টম্‌স্‌কে আপনার ব্যাপারে জানান হয়েছে—লাইন ক্লিয়ার।' নিজের দক্ষতায় নিজেই খুশি হয়ে উঠেছে আসলাম। এক গাল হেসে বলল, 'স্যাটিসফায়েড, বস্?'

'উইল ডু। ফর দা মোমেন্ট, ইয়েস।'

ভাটপাড়ায় পৌছেই বিদায় করে দিল রানা আসলাম আর রিতাকে। একটা হোটেলে কামরা ভাড়া করে দেবাশীষের স্যুটকেস দুটো নামিয়ে রাখা হল, গাড়ী নিয়ে চলে গেল আসলাম ও রিতা—বেনাপোলে অপেক্ষা করবে রানার জন্যে।

ট্রেনের টাইম টেবিলটা দেখে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা। সি. পি. দাস রোড পাওয়া গেল, বাঁড়ুজ্জে ম্যানসনও পাওয়া

গেল, কিন্তু নিজামুদ্দিন আহমেদকে পাওয়া গেল না। বিরাট তালা ঝুলছে দরজায়। তালাটা পরীক্ষা করেই বোঝা গেল সরকারের তরফ থেকে সীল করে দেয়া হয়েছে দোকানটা। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগে উঁকি ঝুঁকি মেরে যতটা সম্ভব দেখার চেষ্টা করল রানা। দরজার দুই ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে কিছুই দেখা গেল না ভিতরে। ভিতরটা অন্ধকার।

কাঁধের উপর দুটো টোকা পড়তেই চমকে পিছু ফিরল রানা। এক নজরে চিনতে পারল সে, সি. আই. ডি-র লোক। একগাল হাসল লোকটা।

'কাকে খুঁজচেন, মশায়?'

'নিজামুদ্দিন সাহেবের দোকান বন্ধ কেন? ব্যবসা গুটিয়ে ফেলল নাকি ভদ্রলোক?'

'হ্যাঁ। গুটিয়ে দেয়া হয়েচে। আপনার কি দরকার ওর কাচে?'

'একটা কার্ড ছেপে দেয়ার কথা ছিল। কাল সকালেই টেলিফোনে কথা হয়েছে, আর আজ বন্ধ করে দিল ব্যবসা?'

'কাল সকালে কতা হয়েচে?' সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আপদমস্তক দেখল রানাকে সাব-ইন্সপেক্টার। 'কাল কটার সোমায় কতা হয়েচে?'

'এই দশটা এগারোটা হবে। কেন? কি ব্যাপার...'

'মশায়ের পরিচয়টা জানতে পারি?'

পাসপোর্টটা বের করে ওর হাতে দিল রানা। বাংলা-দেশের পাসপোর্ট দেখা মাত্র সতর্ক হয়ে গেল সাব-ইন্সপেক্টর এন্ট্রিগুলো পরীক্ষা করল। তারপর যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে বলল, 'কাল দুপুরে এই রঙের স্যুট পরা একজনকে ঢুকতে দেকা গেচে এই দোকানে। আপনি আসেননি ত?'

'বোকার মত কথা বলছেন। আমি কাল সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে এসেছি কলকাতায়, পাসপোর্টে এন্ট্রি আছে, দেখুন খেয়াল করে। কিন্তু ব্যাপারটা কি রকম হল, আমাকে আসতে বলে…'

'আমি পুলিশের লোক সেটা টের পেলেন কি করে?'

'সহজ ব্যাপার। ভদ্রলোক হলে এরকম প্রশ্ন করত না।'

'তার মানে? আপনি বলতে চান আমি ভদ্রলোক নই?'

'ভদ্র ত বটেই, অসাধারণ ভদ্র। আমি সাধারণ ভদ্রলোকের কথা বলছি। সাধারণ কেউ এত জেরা করত না। যাই হোক ব্যাপারটা কি খুলে বলুন দেখি?'

'কাগজে দেকেননি? আজকের কাগজে সবই বেরিয়েচে।' পাসপোর্টটা ফেরত দিল সে রানার হাতে। 'পঁচিশ পয়সা দিয়ে একটা কিনে নিয়ে দেকুন। নিজামুদ্দিন আর কার্ড ছাপিয়ে দিতে পারবে না। ব্যবসা বন্ধ।'

'মারা গেছে, না দেউলিয়া হয়েছে?'

'ওসব কিচু নয়। উনি সরকারের অতিথি হয়েচেন।

হাজতে আছেন বর্তমানে।'

ঝট করে সিগারেট বের করল রানা। গোটা দুয়েক ইণ্ডিয়া কিং-এর বিনিময়ে জানা গেল, গতকাল আড়াইটার দিকে একজন অজ্ঞাত পরিচয় লোক খুন হয়েছে নিজামুদ্দিনের দোকানে। পোনে তিনটের দিকে একটা টেলিফোন পেয়ে পুলিশ এসে হাজির হয় এখানে। ভিতরের উঠোনে মাটি খুঁড়ে নিজামুদ্দিন যখন লাশটা নামাতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় পুলিশ এসে পৌঁছোয়। বিনা বাধায় ধরা দিয়েছে নিজামুদ্দিন, কিন্তু কোন কথা বলানো যায়নি এখনো তাকে দিয়ে। একেবারে চুপ হয়ে গেছে। জোর তদন্ত চলছে। দোকানের ভিতর ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাওয়া গেছে ঠিকই, কিন্তু অস্ত্র পাওয়া যায়নি। নিহত লোকটিকে একটা ছোট ক্যালিবারের পিস্তল দিয়ে ঘাড়ের পিছনে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। বেশ কিছু মুসলিম বাংলার প্রচার পত্র পাওয়া গিয়েছে দোকানে।

একটা স্থানীয় দৈনিক কিনে হোটেলে ফিরে এল রানা। চা খেতে খেতে পড়ল খবরটা, নতুন কিছুই জানা গেল না আর। আধঘণ্টা পরই ট্রেন, নইলে নিজামুদ্দিনের সাথে দেখা করা যেত। সেসব দেখা যাবে পরে। এখন আগের কাজ আগে।

ঠিক সাড়ে চারটের সময় দেবাশীষের স্যুট এবং গগল্স্ পরে যশোরগামী ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টে চাপল রানা। স্টেশনে লোকের ভিড়ে একটা মুখ খুবই পরিচিত

মনে হল রানার কাছে, কিন্তু স্মরণ করতে পারল না কোথায় দেখেছে লোকটাকে !

কু-উ-উ ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক, খটাখট খটাখট, নৈহাটি কাঁচড়াপাড়া, চকদহ, তারপর রানাঘাট ; তারপর সোজা বনগাঁ।

এই কম্পার্টমেণ্টে প্যাসেঞ্জার সাতজন। এদের মধ্যে যদি দেবাশীষের পরিচিত কেউ থেকেও থাকে বোঝা গেল না কারো মুখ দেখে।

দেবাশীষের পাসপোর্টের ছবিটার দিকে চেয়ে মনে মনে হাসল রানা। একটা পাঁচ বছরের বাচ্চা ছেলেও বুঝবে ওটা রানার ছবি নয়। মোটামুটি একই ধরনের দৈহিক গড়ণ, কিন্তু আর কোথাও কিছু মিল নেই, কোমল একটা নমনীয় ভাব রয়েছে দেবাশীষের চেহারায়, রানার মধ্যে যার লেশ মাত্র নেই। কঠোর, কিছুটা নিষ্ঠুর ওর চেহারা, চোখ দুটো তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল—দেবাশীষের মত ঢল ঢল পটলচেরা নয়।

কিন্তু কাস্টম্‌স্ আর ইমিগ্রেশনের কেউ লক্ষ্যই করল না রানার চেহারা। অনায়াসে বনগাঁ পেরিয়ে বেনাপোলের চেক পোস্টে পৌঁছে গেল ও মালপত্র সহ। কিন্তু ততক্ষণে বদল হয়ে গেছে। দেবাশীষের স্যুটকেস নয়, অন্য দুটো স্যুটকেস এখন রানার কাছে। বর্ডারে পৌঁছবার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে বদল করা হয়েছে ওগুলো। এ দুটোও অনেকটা দেবাশীষের স্যুটকেসের মতই, ভাল করে লক্ষ্য না করলে ধরবার উপায় নেই।

আসল স্যুটকেস দুটো ভাল মত সার্চ করা হল, একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক ভিতরের জিনিসপত্র এলোমেলো করে দেয়ার জন্যে আপন মনে গজ গজ করে বিরক্তি প্রকাশ করছে, কিন্তু তাতে সার্চের তরতম্য হল না। নকল দুটো ছুঁয়েও দেখল না কেউ, পাসপোর্টের উপর চোখ বুলিয়েই দাগ দিয়ে দেয়া হল খড়িমাটির। মোটা ভদ্রলোক আসল স্যুটকেস দুটো কুলির মাথায় চাপিয়ে রওনা হল। রানা বুঝল, ওকেও নামতে হবে এখানেই।

দ্রুতহাতে তালা পরীক্ষা করল রানা। চাবী মারা। বাম দিকের স্ট্র্যাপ খুলে ডালাটা সামান্য ফাঁক করে হাত ঢুকাল রানা একটা স্যুটকেসের ভিতরে। কাগজ। রশি দিয়ে বাঁধা। সারাটা স্যুটকেস ভর্তি কাগজ রয়েছে মনে হচ্ছে। যতদূর সম্ভব হাতিয়ে দেখল রানা আর কিছুই হাতে পড়ল না। খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে এল রানা বাইরে।

কয়েক পরতা সাদা কাগজ। দামী। স্যুটকেসের ভিতর যাই থাকুক, আচ্ছা করে কাগজে মোড়া রয়েছে সেটা। টুকরোগুলো পকেটে রেখে দিয়ে দ্বিতীয় স্যুটকেসটাও একই কৌশলে পরীক্ষা করল রানা। সেটাতেও একই ব্যাপার। কয়েক পরতা কাগজ ছাড়া কিছুই বাধল না হাতে। ভিতরের জিনিস দেখবার সময় নেই, স্টেশন থেকে বেরিয়ে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে ওর জন্যে মোটা ভদ্রলোক। স্ট্র্যাপগুলো বেঁধে নিয়ে কুলির মাথায় তুলল রানা স্যুটকেস দুটো।

টিকেট কাউন্টারের পাশে মাল নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মোটা লোকটা। কালো একটা মরিস মাইনর দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। পিছন ফিরে নস্যি টানছে লোকটা। আসল দুটোর পাশেই নামাতে বলল রানা কুলিদেরকে নকল স্যুটকেস দুটো। এগিয়ে গিয়ে সিগারেট কিনল এক প্যাকেট। ভাটপাড়া স্টেশনে দেখা সেই লোকটাকে আবার দেখল রানা। একগ্লাস চায়ে বিস্কিট ডুবিয়ে খাচ্ছে রেস্টুরেন্টে বসে।

আড়চোখে লক্ষ্য করল রানা, নকল স্যুটকেস দুটো তোলা হচ্ছে মরিস মাইনরে। একটা সিগারেট ধরাল রানা। ততক্ষণে পিঠের কাছ ঘেঁষে এসেছে মোটা লোকটা। মৃদু একটা ভারি কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন এলো, 'ওটা কোথায়?'

খানিক চুপ করে থেকে রানা বলল, 'স্যুটকেসে। ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছি।'

রানা বুঝল উত্তরটা বেখাপ্পা কিছু হয়নি, কারণ সাথে সাথেই এল দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'সামাদ কোথায়?'

একটু থমকে গিয়ে বলল রানা, 'ভাটপাড়ায়।'

কোথাকার কোন সামাদের ব্যাপারে কি উত্তর দিল সে বুঝতে পারল না রানা, কিন্তু এই উত্তরটাও কপাল গুণে খেটে গেল। আর কোন কথা না বলে, একবারো রানার দিকে না চেয়ে চলে গেল মোটা লোকটা মরিস মাইনরের পাশে, পিছনের দরজা খুলে উঠে পড়ল গাড়ীতে। সাঁ করে

বেরিয়ে গেল গাড়ীটা।

আসলামকে এগিয়ে আসতে দেখে চট করে চাইল রানা রেস্তোরাঁয় চা পান রত লোকটার দিকে। আশ্চর্য, নেই লোকটা ওখানে। কখন সরে গেছে টেরও পায়নি সে।

'ইয়েস, বস্? ঘটনা ঘটল কিছু?'

'কি ঘটেছে বুঝতে পারছি না, কিন্তু মস্ত কিছু ঘটে গেছে। এই একটু আগে কি যেন স্মাগল্ করে নিয়ে এলাম আমি ভারত থেকে বাংলাদেশে।'

'কিভাবে?' অবাক হয়ে গেল আসলাম।

'মোটা এক লোক কাস্টমস্ চেকিং এর একটু আগে দেবাশীষের স্যুটকেসের সাথে ওর নিজের দুটো প্রায় একই চেহারার স্যুটকেস বদলে নিল। স্টেশনের বাইরে এসে দেবশীষেরগুলো রেখে নিজেরগুলো নিয়ে চলে গেল মরিস মাইনরে করে।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল আসলাম। 'কি ছিল ওর ভেতর?'

'জানি না। কাগজে মোড়া কি যেন ছিল। বেশ ভারি।'

'আপনাকে চিনতে পারেনি তাহলে?'

'না, পারেনি। খুব সম্ভব দেবাশীষের চেহারার চেয়ে ওর স্যুটকেসের বর্ণনা দেয়া হয়েছিল ওকে বেশী করে। হয়তো কাপড় আর সান গ্লাসের বর্ণনা দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিল ওর মনিব। তাছাড়া বদলা বদলির সময় বা চেকিং-এর সময় যখন বাধা না দিয়ে ওদের খেলা ওদের হক্সে

খেলেছি, গন্তব্যস্থলে না পৌঁছে টের পাবে না ওরা আমার পরিচয়।'

'এখন কি করতে হবে, বস্?' স্যুটকেস দুটোর দিকে চাইল আসলাম।

'রিতাকে পাঠিয়ে দিন এখানে। আমরা ট্যাক্সিতে রওনা হব। আপনি গাড়ী নিয়ে ফলো করুন ওদের। আস্তানাটা জেনে চলে আসুন খুলনায়।'

'জাস্ট দেখেই ফিরে আসব?' রানাকে মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'ঠিক আছে বস্, খুলনায় কোথায় দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে?'

'রিতাকে নিরাপদ কোথাও রেখে আমি শাহীন হোটেলে উঠব। আটটার মধ্যে যদি খুলনায় পৌঁছেন সোজা চলে আসবেন দেবশীষের বাসায়, আনুষ্ঠানিকভাবে ওর স্ত্রীকে জানাতে হবে ওর মৃত্যু সংবাদটা। যদি সাড়ে আটটার বেশি বেজে যায় তাহলে হোটেলে দেখা হবে। রাইট?'

'অল রাইট, বস্।' জোকারের মত একটা স্যালিউট লাগিয়ে দিয়ে ছুটল আসলাম গাড়ীর দিকে। পিছু ফিরে বলল, 'উইশ ইয়োর লাক।'

সাঁ করে চলে গেল সবুজ করোনা ডিলাক্স যশোর রোড ধরে।

ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়ল রানা রিতাকে নিয়ে।

ছয়

শাহীন হোটেলের চার তালায় একটা কামরা বুক করে স্যুটকেস দুটো পোর্টারের হাতে উপরে পাঠিয়ে দিয়ে রিতাকে মেয়েদের হোস্টেলে রেখে এল রানা। হোস্টেলে ভয়ের কিছুই নেই, তবু যতদূর সম্ভব সাবধানে থাকার নির্দেশ দিয়ে ফিরে এল রানা হোটেলে। চাবী চেয়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে উঠে এল চার তালায়। স্নিগ্ধ একটা স্নানের সুখ কল্পনায় খুশি হয়ে উঠল রানার মন। সারাদিনের ক্লান্তির পর মনের সুখে ভিজবে সে শাওয়ারের নীচে।

ঘরের তালা খুলেই মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। আবার সেই সার্চ।

আশ্চর্য। কী খুঁজছে ব্যাটা? কি এমন জিনিস দেবাশীষের মাধ্যমে রানার কাছে থাকার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছে লোকটা যে একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছে? এতই দরকারী জিনিস···কি সেটা? বোঝা যাচ্ছে, খুঁজছে, কিন্তু পাচ্ছে না লোকটা সেই জিনিস।

আবার একবার তন্ন তন্ন করে খুঁজল রানা। প্রত্যেকটা জিনিস দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দেবাশীষের স্যুটকেস

পরীক্ষা শেষ করে আবার পরীক্ষা করল পাসপোর্টটা তারপর ধরল মানি ব্যাগ।

কার্ডগুলো থেকে নতুন কিছু আবিষ্কার করা গেল না। বিভিন্ন দেশী নোটগুলো পরীক্ষা করে দেখল সে আবার। ডলার, পাউণ্ড, ভারতীয় নোট, বাংলাদেশের দশ টাকার নোট – সবই ব্যবহৃত, পুরোনো। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে বাংলাদেশের একশো টাকার নোট দুটো। ও দুটো একেবারে আনকোরা, কড়কড়ে। কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয়? কিছুই না। টাকা আর কার্ড যথাস্থানে রেখে দিল রানা। হঠাৎ কি মনে করে আবার পরীক্ষা করল রানা নোটগুলো, পুরো একটা সিগারেট ব্যয় করল ওগুলোর পিছনে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়তে শুরু করল।

জাংগিয়া পরা অবস্থায় একহাতে টেলিফোনের রিসিভারটা কানে তুলে নিয়ে অন্য হাতে ডায়রেক্টরি উল্টাল দশ সেকেণ্ড। নীচের রিসিপশনিস্টকে বলল বাইরের লাইন দিতে, লাইন পেয়েই ডায়াল করল দেবাশীষের নম্বরে। একটা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এলো।

'হ্যালো?'

'দেবাশীষ দত্তের বাড়ী না?'

'হ্যাঁ। উনি ত খুলনায় নেই। আপনি কে বলছেন?'

'মিসেস দত্তকে পাওয়া যাবে? আমার নাম মাসুদ রানা। ওঁকে বললেই চিনতে পারবেন। ওঁদের পরিবারের বন্ধু।'

'একটু ধরুন,' ঠকাশ করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল লোকটা।

মিনিট দুয়েক অপেক্ষার পর ভেসে এল শিবানী দত্তের কণ্ঠস্বর। মিষ্টি তরল গলা।

'হ্যালো?'

'মাসুদ রানা বলছি, চিনতে পারছেন?'

'কিছু মনে করবেন না, ঠিক চিনতে পারছি না। পরিচয়টা...'

'একাত্তুরের এপ্রিলে সীমান্ত পেরোবার সময় পরিচয় হয়েছিল। সাতক্ষীরার কাছে...'

'ওহ্-হো! আর বলতে হবে না। চিনতে পেরেছি। আপনি সেই হ্যাণ্ডসাম যুবক। কি করছেন, কোথা থেকে বলছেন?'

'এইমাত্র খুলনায় পৌঁছেছি। ভাবলাম আপনাদের খোঁজ নিই। দু'একদিনের মধ্যেই ফিরে যাচ্ছি ঢাকায়। আছেন কেমন আপনারা? রিতা, দেবাশীষ বাবু, এরা কোথায়?'

'ওরা...আচ্ছা, কি করছেন এখন? চলে আসুন না, এখুনি, সব শুনতে পাবেন তখন। রাতে খাবেন আমাদের এখানে। উনি খুলনার বাইরে গেছেন, আজই ফিরবার কথা, আপনি পৌঁছতে পৌঁছতেই হয়তো এসে পড়বেন। খুব খুশী হবেন উনি এতদিন পর আপনার দেখা পেলে। কি? আসছেন?'

'ঠিক আছে, এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি আমি।'

'আমাদের ঠিকানা হচ্ছে...'

'ফোন গাইড থেকেই দেখে নেব। আসছি তাহলে। রাখি।'

'আসুন।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘরের চারিদিকে চাইল রানা। সারাটা ঘরই সার্চ করা হয়েছে। আলমারীর ডালা খোলা, ড্রয়ারগুলো আধ-খোলা, মেঝেতে বিছানো সতরঞ্চির এক কোণা উল্টানো, বিছানার চাদর এলোমেলো। কিছুই বাকি রাখেনি লোকটা।

সোজা গিয়ে বাথরুমে ঢুকল রানা। শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে ভিজল মিনিট দুয়েক সম্পূর্ণ দিগম্বর অবস্থায়, তারপর মনের সুখে সাবান মাখল সর্বাংগে। আবার শাওয়ারের নীচে যাওয়ার জন্যে এক পা বাড়িয়েই পাথরের মূর্তির মত জমে গেল। বাথরুমের আধ-খোলা দরজার ওপাশ থেকে ক্ষীণ একটা শব্দ শুনতে পেয়েছে রানা। কান পাতল। খানিকক্ষণ চুপ! আবার এল খচমচ শব্দ। বিছানার উপর বসল কেউ।

অতি সন্তর্পণে ব্র্যাকেটে ঝুলান শোলডার হোলস্টারের কাছে চলে এল রানা। পিস্তলের বাটে হাত রাখতেই হেসে উঠল কেউ পাশের ঘরে।

'বোকামী করবেন না মিস্টার মাসুদ রানা, প্লিজ। তাড়াহুড়োর কিছুই নেই, স্নানটা সেরে নিয়ে খালি হাতে

বেরিয়ে আসুন।'

চমৎকার কণ্ঠস্বর লোকটার। ধীরে ধীরে দু'পাট খুলল রানা বাথরুমের দরজা, ধীর পায়ে এসে দাঁড়াল শোবার ঘরে, ন্যাংটো ভাঁড়। প্রকাণ্ড একটা পিস্তল হাতে বসে রয়েছে সেই লোকটা। স্টেশনে দেখা সেই লোক। আধুনিক রুচিসম্মত সুন্দর ছাঁটের স্যুট, পায়ে চকচকে পালিশ করা কালো জুতো, পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম ভদ্রলোক। মুখটা ডিম্বাকৃতি, সুন্দর নাক চোখ। বয়স ত্রিশ কি বত্রিশ। স্বাস্থ্যটা রানার মত নয়, তাছাড়া আর সবই রানার চেয়ে ভাল। অত্যন্ত চকচকে উজ্জ্বল দুই চোখে কৌতুক।

বিস্মিত দৃষ্টিতে রানার আপাদমস্তক লক্ষ্য করল লোকটা, শরীরের মাঝামাঝি এসে থমকে গেল দৃষ্টিটা কয়েক সেকেণ্ড, তারপর উঠে এল রানার চোখে।

'বড় সংকোচের মধ্যে ফেলে দিলেন, মশায়। লজ্জা শরমের বালাই আপনার নেই বুঝতে পারছি, কিন্তু আমারই কান লাল হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। স্নানটা সেরেই আসুন, গল্প করা যাবে তখন।'

'আপনিই খানিক আগে সার্চ করেছেন ঘরটা?'

'উপায় ছিল না,' একগাল হেসে কোঁকড়া চুল ভর্তি মাথাটা চুলকাল লোকটা। যেন এই অপরাধ করে এখন যার-পর-নাই লজ্জিত, এরকম একটা ভাব করল। বিছানার উপর খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে রানার পাসপোর্ট,

ওটার দিকে একবার চেয়ে বলল, 'আপনার আসল পরিচয়টা জানা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। এই স্যুটকেস, ঐ ব্রিফকেস, কোথাও আপনার পরিচয়-পত্র পেলাম না। অথচ আমি জানি আপনি দেবশীষ দত্ত নন। তাহলে কে আপনি? কেন তার ছদ্ম-পরিচয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? না জানতে পারলে পেটের ভাত হজম হচ্ছিল না। কাজেই খানিকক্ষণ আগে সার্চ করেও আবার ফিরে আসতে হল আমাকে আপনার সাথে মুখোমুখি পরিচিত হতে। আপনার নাম অনেক শুনেছি, এইভাবে পরিচিত হতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি। আপনার মত একজন স্বনামধন্য সিক্রেট এজেন্টের সাথে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি। ভেরি গ্লাড টু মিট ইউ, ইনডিড। কিন্তু আমাদের কল্পনায় আপনার রূপটা আপনার বর্তমান রূপের অনুরূপ নয়। স্নানটা সেরে নিলেই ভাল হত না কি?'

'বেশি কথা বলা আপনার একটা বদভ্যাস, তাই না?'

'হ্যাঁ। সত্যি বলতে কি, এটাই একমাত্র বদভ্যাস।' উঠে দাঁড়াল লোকটা, রানার পাশ কাটিয়ে বাথরুমে ঢুকে পিস্তলটা বের করে নিল হোলস্টার থেকে। 'নিন, এবার দয়া করে স্নান করে নিন। তাড়াহুড়োর কোন দরকার নেই, প্রচুর সময় আছে আমার হাতে।' বেড রুমে চলে এল লোকটা। 'এভাবে আপনার অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত।'

কোন কথা না বলে গোসল করে নিল রানা। শার্ট প্যান্ট পরে বেরিয়ে এলো। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সিঁথি করায় মন দিয়েছে সে এখন। কথা বলে চলল লোকটা।

'প্রথমে আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই। আমার নাম গোপাল ভৌমিক। দেবাশীষের ব্যাপারে আমার-আপনার কৌতুহলে অত্যন্ত মিল আছে। অর্থাৎ আমার-আপনার চারণক্ষেত্র এক্। আপনি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে এসেছেন, আমি এসেছি ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস থেকে, এই যা তফাৎ। কিন্তু উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক। কাজেই আমাদের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি থাকা কোন অবস্থাতেই উচিত নয়। আমরা একসাথেই কাজ করতে পারি এই ব্যাপারটা নিয়ে, পারি না?'

'কোন্ ব্যাপারের কথা বলছেন বুঝতে পারছি না। আমরা দুই বন্ধু দেশের বিশ্বস্ত কর্মচারী হতে পারি, কিন্তু তার মানেই আমি আপনার বন্ধু হয়ে যাব, এক সাথে কাজ করতে হবে আমাদের, তা কে বলেছে?' শার্টের হাতায় কাফলিংক লাগাচ্ছে রানা।

'দেখুন, আপনি বোধহয় আমার ওপর রেগে গেছেন। আপনার ঘরে ঢুকে আপনার পরিচয় জানবার চেষ্টা না করে আমার আর কোন উপায় ছিল না। কেন আরেকজন লোক দেবাশীষ দত্তের ছদ্মবেশে দেবাশীষের পাসপোর্ট দেখিয়ে বর্ডার ক্রস করছে সেটা না জেনে রাস্তা ছিল না আমার।

ভাগ্যিশ গোপনে সার্চ করেছিলাম, নইলে কি করে জানতাম যে আপনি শত্রু পক্ষের লোক নন, একজন সহকর্মী ? যে কোন মুহূর্তে সেম-সাইড হয়ে যেতে পারত। আমরা একসাথে কাজ করলে অর্ধেক সময়ের মধ্যেই সমাধান করে ফেলতে পারব এই জঘন্য জটিল সমস্যার। পারস্পরিক সহযোগিতা…'

কথার মাঝখানেই রানার হাত থেকে কাফলিংকটা ফসকে গিয়ে পড়েছিল গোপাল ভৌমিকের পায়ের কাছাকাছি, তুলে নিল সেটা রানা। পরমুহূর্তেই পাল্টে গেল সম্পূর্ণ অবস্থাটা। প্রকাণ্ড মাউযার পিস্তলটা ছিটকে চলে গেল ঘরের এক কোণে, রানার এঁটে ধরা জুডো হোল্ডের চাপে ডান হাতটা বাঁকা হয়ে গেল ভৌমিকের, ব্যথার চোটে ককিয়ে উঠল সে। ওর পকেট থেকে বের করে এনেছে রানা ততক্ষণে নিজের ওয়ালথার।

'উঠে দাঁড়ান,' হাতটা ছেড়ে দিয়ে দুই পা পিছিয়ে এসে বলল রানা। 'কোটটা খুলে ঐ চেয়ারের ওপর ফেলুন, তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ান। গেট আপ।'

কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে চেয়ে রইল গোপাল ভৌমিক রানার দিকে, তারপর পরাজিত ভংগিতে আদেশ পালন করল। কোটের পকেট থেকে সব জিনিসপত্র বের করে রাখল রানা টেবিলের উপর। রুমাল, পাসপোর্ট, মানিব্যাগ, খুচরো পয়সা, পেন, একটা ছোট চাবীর রিং, নখ কাটার ছুরি—সব। তারপর হুকুম করল, 'প্যান্ট খুলে ফেলুন।'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল গোপাল ভৌমিক, লাল

হয়ে উঠল ফর্সা গলাটা।

'কি বললেন?'

'যা বলেছি শুনেছেন আপনি। স্বেচ্ছায় খুলে ফেলুন, নইলে মাথার পিছনে পিস্তলের বাটের টোকা পড়বে। তখন কাজটুকু করতে আমার অসুবিধে হবে না। খুলে ফেলুন।'

'দেখুন, আপনি···মানে, আপনার···'

'আর একটা কথা বললে মাথার পিছনে সুপুরী তুলে দেব। খুলুন শীগগির।'

ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বেল্ট খুলতে যাচ্ছিল গোপাল ভৌমিক, হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল।

'না। মারুন আপনি। ওভাবে প্যান্ট খোলাটাই কম অসম্মানজনক।'

হেসে ফেলল রানা। বলল, 'বেশ। ঠিক আছে। ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে আপনার গোপাল ভাঁড়গিরি অন্যখানে গিয়ে করবেন। আমি পছন্দ করি না, উলংগ অবস্থায় গোসল করবার সময় কোন জোকার আমার ঘরে ঢুকে এসে পিস্তল দেখাক।'

'সেজন্যে ক্ষমা চাইছি আমি মিস্টার মাসুদ রানা। কাজটা আমার উচিত হয়নি। তবে আমার সার্ট প্যান্ট খুললে আপনার মত সুপুরুষ দেখাবে না এটুকু সান্ত্বনা আপনাকে দিতে পারি। আমার পা দুটো মুরগীর ঠ্যাঙের মত, কোন রকম পেশীর বালাই নেই, স্বীকার করছি

খুশি হয়েছেন এবার? শোধবোধ? এবার দয়া করে অনুমতি করুন, বসি। নিশ্চিন্তে দেখুন আমার পরিচয়-পত্র, কথা দিচ্ছি, একটা আংগুল পর্যন্ত নড়াব না। যদিও নতুন কিছুই পাবেন না আপনি আমার পাসপোর্ট দেখে, তবু দেখুন, দেখাটাই নিয়ম...'

'শাট আপ।' ধমক দিল রানা। তারপর অপেক্ষাকৃত নরম কণ্ঠে বলল, 'উফ্, অতিরিক্ত কথা বলেন আপনি!'

'হ্যাঁ, বলেছি ত, এটাই আমার...' রানাকে চোখ পাকাতে দেখে দুই হাতে নিজের মুখ চেপে ধরল গোপাল ভৌমিক।

ঘরের কোণ থেকে পিস্তল কুড়িয়ে নিয়ে এসে টেবিলের উপর রেখে পরীক্ষা করল রানা ভৌমিকের কাগজপত্র। সত্যিই, কিছুই পাওয়া গেল না। ওগুলো কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে সিগারেট ধরাল। কোটটা ছুঁড়ে দিল ভৌমিকের কোলের উপর। সেটা তুলে নিয়ে ভাঁজ করে কাঁধের উপর ফেলল ভৌমিক, তারপর বলল, 'বলেছিলাম না? শুধু শুধু সময় নষ্ট। দেখলেন ত? এখন আমার সম্পর্কে খোঁজ করুন, কিম্বা আমার মৃত্যুর পর সংবাদ দিতে যান, আমার অফিসের কেউ বুঝতেই পারবে না কার কথা বলছেন, তারা আমাকে চেনেই না, কোনদিন নামও শোনেনি, ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের নামও শোনেনি ওরা কোনদিন। আপনার সম্পর্কেও যদি আমরা খোঁজ করতে যাই, আপনার ডিপার্টমেন্টের কেউ চিনতেই পারবে না আপনাকে। আহা,

কী জীবন আমাদের ! স্পাইগিরি মহা সুখ, যদি না পড়ো ধরা। তাই না ?'

'খুব সম্ভব।'

'যাই হোক, আমার প্রস্তাবটা সম্পর্কে কিছু বলছেন না যে ? রাজি হলে আপনার লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। কি বলেন ?'

চুপচাপ সিগারেট টানছে রানা। জবাব দিল না।

'আপনার দ্বিধার কারণ আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি,' বলল ভৌমিক। 'আমাকে বিশ্বাস করবার, বা আমার ওপর আস্থা রাখবার কোন কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। না পাওয়াই স্বাভাবিক। আমার দিকটা আমি ভেঙে বলি, তারপর যদি আপনার আপত্তি না থাকে, একসাথে কাজ করব আমরা। সত্যি বলতে কি, আপনার সাথে কাজ করবার সুযোগ পেলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। আপনার সহযোগিতা পেলে আমার খুবই উপকার হবে। আর যদি আপনি রাজি না হন, ঠিক আছে, আলাদা ভাবেই কাজ করব আমরা, কিন্তু পরস্পরের বন্ধু হিসেবে, শত্রু হিসেবে নয়। ঠিক আছে ? বেশ। রাজেশ মল্লিক বলে এক লোকের পিছনে লেগেছি আমি আসলে। লোকটা আসলে ভারতীয়, দারুণ চালু লোক, হংকং, সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, কাঠমুণ্ডু, সব জ্বালিয়ে খেয়ে, এবং সব জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে বর্তমানে তিনি দয়া করে খুলনায় অবস্থান করছেন। এবং হঠাৎ ভয়ংকর কম সময়ের মধ্যে ভয়ংকর বড়লোক হয়ে

পড়েছেন। আমার বস্ জানতে চান, কিভাবে সম্ভব হল এটা।'

কথার ফাঁকে স্যুট পরে তৈরী হয়ে নিয়েছে রানা। টেবিলের উপর থেকে তুলে পিস্তলটা ছুঁড়ে দিল গোপাল ভৌমিকের দিকে, খপ করে ধরে ফেলল ও সেটা শূন্যে। মুখোমুখি বসল এবার রানা।

'আসলে আমরা দু'জন দুই ব্যাপারে কাজ করছি। দু'জনের পথ সম্পূর্ণ আলাদা। দুটো সরল রেখা এক জায়গায় কাট করেছে, এছাড়া আর কোন মিল নেই। এক-সাথে কাজ করার প্রশ্নই ওঠে না।'

'ধীরে, বন্ধু ধীরে। ব্যস্ত হবার কিছুই নেই। শুনলে পরে আপনার ত ক্ষতি হচ্ছে না কিছু, বরং মাগনা কিছু তথ্য জানতে পারছেন। আমাকে বলতে দিন আগে সবটা।'

'ঠিক আছে, বলুন। কিন্তু সংক্ষেপে। একটু পরেই বেরোতে হবে আমার।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। বেরোবেন খন। সাধারণ অবস্থায় রাজেশের ব্যাপারে বাংলাদেশের পুলিশকে কিছু তথ্য জানিয়ে দিয়েই আমরা নিশ্চিন্ত থাকতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এবং লজ্জারও বিষয়, লোকটা এক সময় আমাদের সার্ভিসে কাজ করত।' অত্যন্ত লজ্জার ভাব প্রকাশ পেল ভৌমিকের চেহারায়। 'হ্যাঁ। ও একজন নামজাদা এজেন্ট ছিল ভারতের। কিন্তু বছর তিনেক আগে ওর নানান

ধরনের ছল চাতুরী প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায় বরখাস্ত করা হয়েছে ওকে। আর যেখানে যা করুক, আমরা চাই না, বাংলাদেশে উল্টো-সিধে কিছু করে আমাদের লজ্জাকর কোন পরিস্থিতিতে ফেলুক ও। ভারতের ওপর যদি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় ওর কার্যকলাপে, সেটা আমরা সহ্য করতে রাজী নই। কাজেই পাঠানো হয়েছে আমাকে। আমি এসে দেখলাম দেবাশীষ দত্ত নামধারী এক ভদ্রলোকের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ মেলামেশা রয়েছে আমাদের রাজেশ মল্লিকের। এবার কিছুটা আগ্রহ বোধ করেছেন কি মিস্টার মাসুদ রানা?' হাসল ভৌমিক। 'মত পাল্টাতে ইচ্ছুক?'

'বোঝা যাচ্ছে, বহুদূর এগিয়েছেন আপনি। আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই। আমার কাছ থেকে কোন সাহায্য আপনি পাবেন বলে আমার মনে হয় না।'

'আপনার বিনীত নম্রতা আমাকে বিস্মিত করছে, কিন্তু মুগ্ধ করতে পারছে না। হয়তো মুগ্ধও করত, যদি আপনার সম্পর্কে ভারতীয় ডোশিয়ারটা আমার পড়া না থাকত। আমি জানি কি পরিমাণ ধূর্ত, ভয়ংকর ও দুঃসাহসী লোক আপনি।'

'কিন্তু ভিন্ন কাজে এসেছি আমি। দুঃখিত।' উঠে দাঁড়াল রানা।

'ঠিক আছে।' উঠল গোপাল ভৌমিকও। 'তবে আমার প্রস্তাবটা আবার একবার ভেবে দেখবার অনুরোধ

করছি। পরে আবার যোগাযোগ করব আমি। চলি তাহলে।' দুই পা এগিয়েই থামল। 'দেবাশীষ দত্তের বাড়ীতে যাচ্ছেন বুঝি?'

রানাকে নিরুত্তর দেখে বলল, 'সাবধান থাকবেন। শুনেছি শিবানী দত্ত মানুষ খায়। হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হিসেবে সাবধান করে দেয়া আমার কর্তব্য।'

'তাই নাকি? আপনাকে ত খায়নি—আস্তই ত আছেন দেখছি?'

'আমাকে?' হো হো করে হাসল গোপাল ভৌমিক। 'না পারেনি। আমি কোনদিন ধারে কাছে গেছি নাকি? ওরেব্বাপ! ডেঞ্জারাস! দারুণ মেয়েলোক! অবশ্য রাজেশ মল্লিক চেটে পুটে খেয়ে নিয়েছে সব। আঁটি আর ছোবড়া ছাড়া কিছুই পাবেন না আপনি।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সুবেশী ভদ্রলোক, করিডোরে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দু'আঙুল নেড়ে টাটা করল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল মসৃণ গতিতে।

সাত

বেল টিপতেই দরজায় এসে দাঁড়াল শিবানী দত্ত। এক-গাল মিষ্টি হাসি নিয়ে অভ্যর্থনা করল। একটা সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে বসাল রানাকে। পাশে এসে বসল গা ঘেঁষে।

'উঃ, কতদিন পর দেখা। তাই না? ঢাকাতেই ছিলেন?'

'হ্যাঁ। আপনারা ত বেশ ভালই আছেন দেখতে পাচ্ছি? কোথায়, আর সবাই কোথায়?'

'উনি আজ সকালেই কলকাতায় গিয়েছেন। এতক্ষণে এসে পড়ার কথা। এসে যাবেন যে কোন মুহূর্তে। আর আমার ননদিনী শ্রীমতী রিতা দেবী আছে হোস্টেলে। সামনে পরীক্ষা ত, বাড়ীতে নাকি পড়াশোনা হয় না। তা আপনার খবর শোনান। বিয়ে করেছেন?'

'নাহ্। বিয়ে আর হোল কই। তাছাড়া কোন মেয়ের স্বামী হবার যোগ্যতা আমার আছে বলে মনে করি না।'

'কী যে বলেন,' হাসল শিবানী দত্ত খিল খিল করে। 'আপনার মত সুপুরুষ স্বামী পেলে বর্তে যাবে যে কোন মেয়ে।' সরাসরি চাইল রানার চোখে। 'কি করছেন? চাকরী না ব্যবসা?'

'ব্যবসাই বলতে পারেন।' মৃদু হেসে বলল রানা। 'প্রাইভেট গোয়েন্দাগিরি করছি।'

সন্দেহের ছায়া পড়ল শিবানী দত্তের চোখে। সহজ ভাবটা অদৃশ্য হয়ে গেল নিমেষে।

'ও।' আড়ষ্ট ভংগিতে বসে রইল সে কয়েক সেকেণ্ড। রানা বুঝল দ্রুত চিন্তা চলেছে শিবানী দত্তের মাথায়। কিন্তু অল্পক্ষণেই সামলে নিয়ে সহজ হয়ে গেল সে আবার। 'নিশ্চয়ই খুব মজার কাজ? মহিলা গোয়েন্দা হয় না? হলে আমি যোগ দিতাম আপনার সাথে।'

'আপনি কেন এসব বাজে কাজে আসবেন? এত স্বাচ্ছন্দ্য আর এত সুখের সংসার ফেলে কি কেউ খুন, জখম আর জালিয়াতীর পিছনে হন্যে হয়ে ঘুরে মজা পেতে পারে? আপনার সুখী……'

হঠাৎ ক্ষেপে উঠল শিবানী দত্ত। কিম্বা ক্ষেপে ওঠার ছুতো খুঁজছিল, পেয়ে গেল।

'সুখী? সুখ কোথায় দেখলেন আপনি? কতটুকু জানেন আপনি আমার জীবনের?'

'তেমন কিছুই জানি না, তবে বাইরে থেকে দেখে আপনাকে ত আমার রীতিমত সুখী বলে মনে হয়েছে।'

'ভেতরটা দেখলে সম্পূর্ণ উল্টো ধারণা হত। সুখী! খুব সুখী। ত্যাজ্য-স্ত্রী যতটা সুখী হয়, ততটাই সুখী।'

'ত্যাজ্য-স্ত্রী মানে? আপনার স্বামী, মানে, দেবাশীষ বাবু কি…'

'হ্যাঁ। ত্যাগ করেছে আমাকে। ফিরতে দেরি দেখে, তাছাড়া আপনি আসছেন সেজন্যে ওর ঘরে গিয়েছিলাম বহুদিন পর। সব দরকারী জিনিস পত্র সরিয়ে ফেলেছে ও। বোধহয় কয়েক সপ্তাহ ধরেই সরাচ্ছিল। ঘরের দিকে এক নজর চেয়েই বুঝতে পারলাম, আর আসবে না ও কোন দিন। চলে গেছে ও আমাকে ছেড়ে; ওর বোনকে কেন নিয়ে যায়নি, তাই ভাবছি।'

'এসব কি বলছেন আপনি? উনি আপনাকে একলা ছেড়ে চলে যাবেন কেন? ঝগড়া হয়েছে বুঝি? বহুদিন পর ওঁর ঘরে গিয়েছিলেন···আপনারা এক ঘরে থাকেন না?'

'না।' গম্ভীর মুখে চেয়ে রইল শিবানী রানার মুখের দিকে। রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে। 'গত আট-নয় বছর আমাকে ছুঁয়েও দেখেনি দেবাশীষ। কল্পনা করতে পারেন?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা। জবাব দিল না।

'নয় বছর আমি জানি না স্বামীর সোহাগ কাকে বলে। ভাবতে পারেন? এর নামই কি সুখ? এগার বছর বিয়ে হয়েছে, সন্তানের মুখ দেখিনি আমি, একেই যদি আপনার সুখী পারিবারিক জীবন মনে হয়, আমার বলবার কিছুই নেই।' চোখ পাকিয়ে চাইল শিবানী রানার দিকে। রানা কথার উত্তর দিচ্ছে না দেখে বলল, 'এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার বলা উচিত হচ্ছে না। কিছু মনে করবেন না, সুখের প্রসঙ্গে বলে ফেললাম অনেক কথা। ওর ঘরে গিয়ে সব দেখে কতটা

বিচলিত হয়ে আছি নিশ্চই বুঝতে পারছেন?' চোখ জোড়া নামাল, 'আমি ভাবতেও পারিনি এইভাবে চলে যাবে লোকটা। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে ঝগড়া করতে পারত, দাবি খাটাতে পারত, শাসন করতে পারত—কিছুই না বলে চলে যাবে এভাবে? আমি যেন রাস্তার একটা ঘেয়ো নেড়ি কুত্তা!'

'কি এমন অভিযোগ আছে ওঁর আপনার আর রিতার বিরুদ্ধে?' প্রশ্ন করল রানা।

'রিতার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। ওঁরা ভাই-বোন নিষ্কলুষ স্বর্গের দেবতা—সব দোষ আমার। রিতাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছিল গত পরশু, কি প্ল্যান করেছে ভাই-বোন মিলে কিচ্ছু জানি না, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, খানিক আগে পর্যন্ত আমি জানতামই না যে ও হোস্টেলে আছে খুলনাতেই। কিম্বা সত্যিই সত্যিই ঢাকায় গিয়ে থাকলে কখন ফিরল, এত তাড়াতাড়ি কেন ফিরে এল, কিছুই জানি না। আপনার সাথে ফিরেছে রিতা?' সরাসরি প্রশ্ন করল এবার শিবানী। 'আপনার কাছেই গিয়েছিল ও ঢাকায়?'

রানা বুঝল, এতক্ষণে সুযোগ এসেছে আসল কথা পাড়বার। এক্ষুণি সুযোগটা গ্রহণ না করলে একরাশ দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে সময় নষ্ট করবে শিবানী ওর। প্রেম নিবেদন করে বসাও বিচিত্র নয়। হঠাৎ করে আঘাত দিলে কথা বন্ধ হয়ে যাবে শিবানীর, ধীরে ধীরে সব

কথা ভাঙতে হবে ওর কাছে। রিতার খুলনায় পৌঁছনোর খবর এত দ্রুত কিভাবে পৌঁছল ওর কাছে জানা দরকার, এছাড়া আরো কিছু তথ্য হয়তো পাওয়া যেতে পারে। কাজেই সইয়ে নিয়ে এগোতে হবে ওকে। মোটামুটি গুছিয়ে নিল রানা সবটা ব্যাপার মনে মনে।

'হ্যাঁ। দেবাশীষ বাবুর চিঠি নিয়ে গিয়েছিল আমার কাছে। সাহায্যের জন্যে।'

'সাহায্য। কি ব্যাপারে সাহায্য?'

'দেবাশীষ বাবুর প্রাণহানির আশংকা দেখা দেয়ায় উনি আমার সাহায্য চেয়েছিলেন।'

'তারপর?'

'সাহায্য পৌঁছবার আগেই মারা গেছেন ভদ্রলোক।'

'কী! কি বললেন! মারা গেছে? দেবাশীষ মারা গেছে?'

'হ্যাঁ। কলকাতার এক হোটেলে তাকে খুন করা হয়েছে। আপনার লোকেই করেছে কাজটা।'

হাঁ করে চেয়ে রইল শিবানী দত্ত। কয়েক সেকেণ্ড কথা যোগাল না তার মুখে। বার দুই ঢোক গিলল। তারপর বলল, 'এসব কি বলছেন আপনি! আমার লোক! আমি আমার স্বামীকে খুন করাব কেন?'

'আপনি খুন করিয়েছেন, তা বলছি না। শুধু বলছি আপনার লোকেই খুন করেছে ওকে। এই ব্যাপারে আরো ইনভেস্টিগেশন করেছি আমি। আপনি জড়িয়ে পড়ছেন। মস্ত ঝামেলায় ফেঁসে যাচ্ছেন দেখে এসেছি আমি আপনার

কাছে। আগে ভাগেই যদি আমাকে সব খুলে বলেন, তাহলে হয়তো আপনাকে বাঁচাবার পথ পাওয়া যেতেও পারে। নইলে এমন ভাবে জড়িয়ে যাবেন যে কেউ রক্ষা করতে পারবে না আপনাকে থানা-পুলিশের হাত থেকে।'

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল শিবানী, কিন্তু অবাক হল রানা মহিলার আত্মবিশ্বাস দেখে। এত আকস্মিক সংবাদ পাওয়ার পরও মাকড়সার মত কামনার জাল বুনে চলেছে চারিপাশে, যদি আটকে নেয়া যায় রানাকে! আঁচল খসে গেছে কাঁধ থেকে, জোরে শ্বাস নিচ্ছে যেন ব্লাউসের নীচে কাঁচুলী বিহীন বুকটার প্রতি লক্ষ্য যায় রানার, লোভ জাগে। আশ্চর্য!

'আমি···আমি কি খুলে বলব আপনাকে! কি জানি আমি? কেন আমি ফেঁসে যাব? কিছুই বুঝতে পারছি না আমি মাসুদ সাহেব। মৃত্যু সংবাদ দিয়ে শোক প্রকাশের সময়ও দিচ্ছেন না, আপনি আমাকে, ভয় দেখাতে শুরু করেছেন থানা-পুলিশের—সত্যি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমি। একটু বুঝিয়ে দিন।'

'দেখুন, আমি কি বলছি আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। শোক ও সন্তাপ ঘটা করে প্রকাশ করবার জিনিস নয়—কাঁদব কি কাঁদব না, বেদনাটা প্রকাশ করব, নাকি আপাততঃ মুলতুবি রাখব, এসব ভেবে কেউ শোক করে না। যেটা ভেতর থেকে আসছে না সেটার অভিনয় করবার কোন প্রয়োজন নেই। আমি সত্যি কথায়

আগ্রহী। আপনার আপত্তি থাকলে বলুন, উঠে চলে যাচ্ছি আমি। আপনার ভালর জন্যেই জানতে চাইছি আমি সব, আপনি না বললেও অনেক কিছুই জেনেছি আমি, বাকিটুকু জেনে নিতে দুদিনের বেশি সময় লাগবে না আমার। বলুন, উঠব?'

খপ করে রানার হাত ধরল শিবানী। টান দিয়ে ফেরাল ওর দিকে।

'নিশ্চয়ই রিতা আপনার কাছে যা খুশী তাই বলেছে আমার নামে? কি বলেছে রিতা?'

'আপনাদের পারিবারিক ব্যাপারে আমি মোটেই আগ্রহী নই মিসেস দত্ত। যেটুকু কোর্টে না উঠলেই নয়, সেটুকু উঠবে। আমি জানতে চাই আপনার সর্বশেষ প্রেমিক রাজেশ মল্লিকের সম্পর্কে। ঠিক কি ব্যবসায়ে নামতে বাধ্য করেছিলেন আপনি দেবশীষকে সে সম্পর্কে।'

'ও। বুঝলাম। এসব কথা জেনেছেন আপনি রিতার কাছে। নিজের কু-চরিত্রের কথা নিশ্চয়ই বলেনি ও আপনাকে? আমার একশোটা প্রেমিক আছে, স্বীকার করি, কিন্তু ও কি? ও নিজে কত বড় মহাপাতকী সেটা শুনে যান আমার কাছ থেকে।' প্রতিহিংসায় জ্বলজ্বল করছে শিবানীর চোখ জোড়া।

'দেখুন, আমার সময় কম। ওসব পারিবারিক কেচ্ছা-কাহিনী শুনবার সময় নেই। বিপদের গুরুত্ব আপনি বুঝতে পারছেন না, সেজন্যেই এইসব আজে বাজে কথায়

সময় নষ্ট করছেন। শুধু মার্ডার নয়, চোরাচালান সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন আপনি। আপনি নিজে কতটা দোষী আমি জানি না, দোষ থাকলে শাস্তি হবেই, কিন্তু আমি চাই না, শুধু সংগদোষে জড়িয়ে গিয়ে আপনি বাপ-দাদা এবং স্বামীর বংশের নাম ডোবান।'

বাপ-দাদার কথায় টনক নড়ল শিবানীর। স্বামীর বংশ মর্যাদা চুলোয় যাক, কিন্তু বাপের···সোজা চাইল সে রানার চোখে, এক কথায় জবাব দিল, 'আমি কিছুই জানি না।'

রানা দেখল এই ভাবে কোন কথা এগোবে না। কাজেই অন্য রাস্তা ধরল।

'রাজেশ মল্লিককে বাঁচাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই মিসেস দত্ত। ওকে বাঁচান যাবে না। একজন মস্ত ঠগ হিসেবে ইতিমধ্যেই বিখ্যাত হয়ে গেছে সে। তাছাড়া আপনার গলায় ছুরি দিয়ে যদি নিজের চামড়া বাঁচান সম্ভব বলে মনে করে তাহলে জবাই করতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করবে না ও। কথাটা বিশ্বাস করলে সুখী হব। আরো একটা কথা, আপনি যতই তার প্রেমে হাবুডুবু খান না কেন, আপনার প্রতি প্রেমের এক আধটা ছিটে ফোঁটাও নেই ওর মধ্যে। ও এসেছিল ওর বিশেষ স্বার্থ নিয়ে, আপনাকে নির্মম ভাবে ব্যবহার করেছে নিজের স্বার্থোদ্ধারে, কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে বাঁ পায়ের কড়ে আংগুল দিয়েও ছুঁয়ে দেখবে না আপনাকে। কবে ওর সাথে শেষ দেখা হয়েছে আপনার?'

'পরশু রাতে।'

'দেবাশীষকে খুন করার প্ল্যান কি তখনই বলেছিল আপনাকে?'

'খুন সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।'

'কি সম্পর্কে জানেন?'

'আমি কিছুই জানি না।'

'ঠিক আছে, আমি যা জানি বলছি, ভুল হলে শুধরে দেবেন।' একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'কোন একটা গোপন বেআইনী কাজে জড়িয়েছিল রাজেশ মল্লিক নিজেকে। যোগ দিয়েছিল ভয়ংকর একটা সংঘবদ্ধ দলে। তাদেরই নির্দেশে আপনার সাথে প্রেমের অভিনয় করেছিল সে। আসল লক্ষ্য ছিল ওদের দেবাশীষ দত্ত। আপনার মাধ্যমে দেবাশীষের কাছে প্রস্তাব পাঠাল রাজেশ, সপ্তাহে একদিন করে কলকাতা-খুলনা করতে হবে, কোন ঝুঁকি নেই, কাস্টম চেকিংয়ের সময় শুধু একটু উদাসীন থাকতে হবে নিজের স্যুটকেস দুটোর ব্যাপারে, কাজটা খুবই সহজ, কিন্তু এর বিনিময়ে মোটা অংকের টাকা দেয়া হবে তাকে। দেবাশীষের মত-একজন সৎ লোকের কাছে সরাসরি এই প্রস্তাব দিতে সাহস পায়নি ওরা, তাই আপনার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল ওদের। ওকে রাজি করাবার ভার আপনার ওপর ছেড়ে দিয়েছিল রাজেশ। তাই না?'

'আমি এসব ব্যাপারের কিছুই জানি না। সত্যি বলছি...'

''কতটা সত্যি বলছেন আমি জানি।'

'সত্যিই, ব্যাপারটা যে বেআইনী, তা আমার জানা ছিল না।'

'ছিল। দেবাশীষ বলেছে আপনাকে সেকথা। নিশ্চয়ই প্রথমে অস্বীকার করেছে কাজটা নিতে। নইলে সন্দেহ আসত রাজেশ বা তার দলের। কিন্তু কেন ও পুলিশের হুমকি দিল না, কেন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের বিশ্বস্ত লোক হয়েও তাদের সাহায্য নিল না? আপনি বলতে পারবেন?'

'পারব। টাকার জন্যে।'

'অসম্ভব। টাকা দিয়ে দেবাশীষকে কেনা যাবে না। ওর বিশেষ কোন দুর্বলতার সুযোগ নেয়া হয়েছে। কি সেটা?' চুপচাপ সিগারেট টানল রানা কিছুক্ষণ। 'ওর কি এমন দুর্বলতা ছিল যার সুযোগ নিয়েছেন আপনি? কেন ও এত ভংয়কর বিপদের মধ্যে, একটা সাংঘাতিক দলের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল একা? বিপদ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল ওর, আমি জানি। এত বড় ঝুঁকি কেন নিতে গেল ও?'

'ওহ্, আপনিও দেখছি ওকে দেবতা ভাবতে শুরু করেছেন! যাকগে, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে কি বলছিলেন?'

'আপনার বা যারা আপনাকে ব্যবহার করেছে, তাদের জানা ছিল না যে বেশ কয়েক বৎসর আগে থেকেই দেবাশীষ

ছিল বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অবৈতনিক তথ্য সংগ্রাহক এবং ইনফরমার। আপনাদের সবাইকে ধরিয়ে দিতে পারত ও ইচ্ছে করলে অনেক আগেই—দেয়নি কেন?' খানিক চুপ করে থেকেও যখন শিবানীর তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না তখন বলল, 'যাই হোক, যতদূর সম্ভব দলের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল রাজেশ শেষের দিকে, গোপনে। দেবাশীষের সাথে কোন গোপন চুক্তিতে এলো সে। এবারো আপনি প্রভাব বিস্তার করলেন ওকে রাজি করানর ব্যাপারে। রাজি হল দেবাশীষ। এই চোরাকারবারের কোন একটা দরকারী জিনিস নিয়ে দুজনের চম্পট দেয়ার কথা ছিল। ভাটপাড়ায় নেমেছিল দেবাশীষ গত কাল সেই জিনিসটা সংগ্রহ করতে। সামাদ বলে একজন লোক গিয়েছে ওর পিছু পিছু ওর ওপর নজর রাখবার জন্যে। রাজেশ তাকে গুলি করে মেরে পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে দেবাশীষের। কিন্তু জিনিসটা নিয়ে রাজেশ মল্লিককে ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়েছিল দেবাশীষ কলকাতায়, সব ব্যবস্থা করেই রেখেছিল সে আগে থেকে। কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য, আমি আর রিতা যখন গিয়ে ওর হোটেল কামরায় পৌঁছলাম ততক্ষণে কাজ সেরে দিয়েছে রাজেশ মল্লিক। কিন্তু যে জিনিসটার জন্যে পিছু ধাওয়া করে এসে খুন করল সে দেবাশীষকে, সেটা পাওয়া যায়নি, পাগলের মত এখনো খুঁজছে সেটা রাজেশ মল্লিক। কি সেই জিনিস, মিসেস দত্ত?'

'রিতা গিয়েছিল কলকাতা পর্যন্ত ?'

'হ্যাঁ। দিল্লী পালিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করেছিল দেবাশীষ। এই দেখুন, টিকেট।' পকেট থেকে টিকেট বের করে দেখাল রানা, 'আজ সকালের ফ্লাইট ছিল। কেন পালিয়ে যাচ্ছিল বোনকে নিয়ে সেটা বোঝা···'

'কেন আবার!' ফুঁশে উঠল শিবানী। 'প্রেম করতে। নিরিবিলিতে বদমাইশী করতে। আর কিচ্ছু না। বললে বিশ্বাস করবেন আপনি, যে ওদের দুই ভাই বোনের মধ্যে কুৎসিত দৈহিক সম্পর্ক ছিল ?'

থমকে গেল রানা। পনের সেকেণ্ড বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শিবানীর মুখের দিকে, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'না। বিশ্বাস করব না।'

'অথচ এটাই সত্যি কথা। দেবাশীষের যে দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছি বলছিলেন এতক্ষণ, সেটা আর কিছুই নয়, এইখানে। একথা প্রকাশ পেয়ে গেলে রিতার বিয়ে দেয়া সম্ভব হত না। এইজন্যে আমার প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল ঐ পিশাচ। আমি খারাপ মেয়েলোক হতে পারি, বাজারে দুর্নাম আছে আমার, কিন্তু এই মহাপাপ করবার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। নিজের ভাইয়ের সাথে···ছি ছি ছি! ঘেন্না!'

'আপনার কাছে প্রমাণ···'

'নিজের চোখে দেখার চেয়ে বড় প্রমাণ কি আছে পৃথিবীতে ? তিন বছর আগে। আমার মাসতুত ভাইয়ের

বিয়ের দিন। মাত্র দুইশো টাকার গয়না কিনে নিয়ে এলো বলে আমার সাথে তুমুল ঝগড়া হল ওর সন্ধ্যেবেলা। আমি চেয়েছিলাম দুই হাজার টাকার গহনা দিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে। রাগারাগি করে আমি একাই চলে গেলাম বিয়ে বাড়ীতে। ঐ বদমাইশ ছুঁড়িটা সারাদিন বিয়ে বাড়ীতেই ছিল। কখন ফিরে এসে দাদার বুকের ভেতর ঢুকেছে জানি না। আমি ফিরেছি ভোর রাতে। এসে দেখি জড়াজড়ি করে ঘুমাচ্ছে দুজন স্বামী-স্ত্রীর মত। বুকে শাড়ী নেই, পা বেরিয়ে আছে উরু পর্যন্ত, পেটিকোটে রক্তের দাগ। কিচ্ছু না বলে চলে গেলাম আমি আমার ঘরে। পরদিন সকালে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম হারামজাদিকে। কোন সন্দেহ রইল না আর। পরীক্ষায় ধরা পড়ল সব। কিন্তু কপাল ভাল ছুঁড়ির, ওর ভাইয়ের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল না বলে বাচ্চা আসেনি পেটে।' বোকার মত রানাকে চেয়ে থাকতে দেখে বলল শিবানী, 'ওর এই একটি মাত্র দুর্বলতা এত শক্তি দিয়েছিল আমাকে। আমার ইচ্ছেমত না চলে উপায় ছিল না ওর। কথাটা প্রচার করে দিলেই সর্বনাশ হয়ে যেত ওর আদরের দুলালী প্রাণের চেয়ে প্রিয় ছোট বোনের।' বাঁকা হাসি হাসল শিবানী। 'অবশ্য আসল সর্বনাশ যা করার সে নিজেই করে দিয়েছিল। এর চেয়ে বড় সর্বনাশ, এর চেয়ে মহাপাপ আর কি হতে পারে একটা মেয়েমানুষের জীবনে?'

'আপনি নিজে পাপ পথে পা দিলেন কেন?'

'সন্তান লাভের জন্যে। সে সব অনেক লম্বা কাহিনী, শুনবার ধৈর্য থাকবে না আপনার।' হঠাৎ রানার হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে দুটো টান দিয়ে ফিরিয়ে দিল শিবানী। বলল, 'আমি খারাপ মেয়েলোক, আমি পুরুষ মানুষ পেলে ক্ষুধার্ত বাঘিনী হয়ে যাই, সব মানি,' কথা বলতে বলতে রানার বাম হাতটা নিজের বুকের ওপর রাখল শিবানী, 'আমি কতটা খারাপ প্রমাণ করে দিতে পারি আমি এক্ষুণি আপনি উৎসাহী হলে, কিন্তু তাই বলে দেবাশীষকে দেবতা জ্ঞান করে আমাকেই সব কিছুর জন্যে দোষী করবেন, সেটা কেন সহ্য করব আমি? আমি যা করেছি, বাধ্য হয়ে করেছি।' বড় করে শ্বাস নিল শিবানী। রানার হাতটা ভরে উঠল ওর নরম বুকের স্পর্শে। একটা হাত রাখল সে রানার উরুর উপর। 'মা হতে চাওয়া কি অপরাধ?' আর একটু কাছে ঘেঁষে এসে রানার গায়ে প্রায় এলিয়ে পড়ল শিবানী। বুক থেকে হাতটা সরিয়ে মুখের কাছে নিয়ে আলতো করে কামড় দিল তালুতে।

বিদ্যুৎ বয়ে গেল রানার শরীরে। ঝিক করে কুচিন্তা খেলে গেল মাথার মধ্যে—হোক না, ক্ষতি কি? পরমুহূর্তে সামলে নিল সে। উঠে দাঁড়াল। সাথে সাথেই লাফিয়ে উঠে বুকের সাথে সেঁটে এল শিবানী।

'রিফিউজ করবেন না, প্লিজ! থেকে যান আজ রাতটা।' দুই হাতে গলা জড়িয়ে ধরল সে রানার, বুকটা ঘষছে রানার বুকে। রক্ত গরম হয়ে উঠল রানার।

দুই কাঁধ ধরে দেড় ফুট দূরে সরাল রানা ওকে। জ্বলজ্বল করছে শিবানীর চোখ, লাল হয়ে উঠেছে গাল দুটো, দ্রুত বইছে শ্বাস-প্রশ্বাস। ফিশফিশ করে বলল, 'প্লি···জ!'

'রিতা খুলনায়, সে খবর কে দিল আপনাকে?'

মদির চোখজোড়ায় এক মুহূর্তের জন্যে আতংক দেখতে পেল রানা। কিন্তু সামলে নিল শিবানী এক সেকেণ্ডের মধ্যেই। বলল, 'কেন? আপনিই ত বললেন!'

'এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না মিসেস দত্ত। আপনি বলেছেন, খানিক আগে পর্যন্ত আপনি জানতেনই না যে রিতা হোস্টেলে আছে খুলনাতেই। কে সংবাদটা দিল আপনাকে খানিক আগে? কে সে? রাজেশ মল্লিক?'

'না।'

'তাহলে কে?'

'বলব না।' কাঁধ থেকে রানার হাত ছাড়িয়ে দিল শিবানী। ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'আপনি এবার আসুন মিস্টার মাসুদ। ওদের কথা ভুলে যেতে চাই আমি। দেবাশীষ বা তার বোন সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উত্তর পাবেন না আপনি আমার কাছে।'

'প্রশ্নটা ওদের সম্পর্কে নয়, আপনি যাদের জালে ধরা পড়েছেন তাদের সম্পর্কে। কারা এরা? কি উদ্দেশ্য ওদের? কি ঘটছে বা ঘটতে চলেছে? আপনি এসবের মধ্যে কতটা জড়িয়েছেন নিজেকে?'

আংগুল তুলে দরজার দিকে ইংগিত করল শিবানী।

'বেরিয়ে যান!'

'রাতের খাবারটা না খাইয়েই বিদায় দিচ্ছেন?' হাসল রানা।

শিবানীর মুখে হাসি নেই। 'এক মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে না গেলে চিৎকার করে লোক ডাকব আমি। গেট আউট!'

'আমার সাথে সহযোগিতা করলে আপনারই মংগল হতো।'

'মৃত্যু হত!'

বিস্মিত দৃষ্টিতে শিবানীর আতংকিত মুখের দিকে চেয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, এমনি সময় ঝন ঝন শব্দে ঘরের কোণে বেজে উঠল টেলিফোন। এক লাফে এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল রানা রিসিভার।

'হ্যালো?'

'এই যে, দেবাশীষ বাবু বলছেন? রিতা পৌঁছেচে?' কর্কশ মহিলা-কণ্ঠস্বর।

'আপনি কে বলছেন?'

'আমি হোস্টেলের সুপার বলছি। ঠিক মত পৌঁছেচে তো বাসায়?'

শিবানী এগিয়ে এসে রিসিভারটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানার হাত থেকে, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রানা ওকে।

'রিতা বাসায় আসবে কেন? হোস্টেলে সীট নেই?

এই রাতের বেলা বিদায় করে দিয়েছেন ?'

'আমি বিদাই করব কেন ? উষ্মা প্রকাশ পেল সুপারের কণ্ঠে। 'আপনার গাড়ী নিয়ে লোক এসেছিল, আপনার স্ত্রীর চিঠি দেখাল, তবেই না যেতে দিয়েছি।'

'কতক্ষণ আগে ?'

'এই তো মিনিট পনের হল। এতক্ষণে ত পৌঁছে যাবার কথা···মুশকিল হল দেখছি···আপনারা ওকে নেবার জন্যে গাড়ী দিয়ে পাঠাননি ?' ভয় পেয়ে গেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

'আমার স্ত্রী হয়তো পাঠিয়েছিলেন। আমি এই মাত্র ফিরলাম বাসায়। উনি আবার পাশের বাসায় গেছেন। আমার গাড়ী গিয়েছিল তো, তাহলে আর ভয়ের কিছুই নেই।'

'কিন্তু এখন পর্যন্ত পৌঁছল না···দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলাম···'

শিবানীর দিকে ফিরল রানা। বলল, 'এই যে, আমার স্ত্রী ফিরে এসেছেন। শিবানী, তুমি রিতাকে আনতে গাড়ী পাঠিয়েছিলে ?' নিজের অজান্তেই মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল শিবানী। রানা বলল, 'ঠিক আছে, আর কোন চিন্তা নেই। এসে পড়বে এক্ষুণি। অনেক ধন্যবাদ, রাখি। কেমন ?'

'পৌঁছলে একটু ফোন করে জানিয়ে দেবেন। আমার আবার ইনসমনিয়া আছে, এমনিতেই ঘুম হয় না রাতে, মাথার মধ্যে চিন্তা থাকলে ত আরো···'

'আচ্ছা, এসে পৌঁছলেই জানাব। নমস্কার।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

খটাশ করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন সজাগ প্রৌঢ়া হোস্টেল-সুপার। রানা ফিরল শিবানীর দিকে। রানার ধাক্কায় কাঁধে ব্যথা পেয়েছিল শিবানী, এক হাতে ডলছে জায়গাটা। ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে রয়েছে রানার দিকে অবাধ্য মেয়ের মত।

'কাকে পাঠিয়েছিলেন চিঠি দিয়ে?'

উত্তর নেই।

'কোথায় নিয়ে গেছে ওরা রিতাকে?'

উত্তর নেই।

দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকাল রানা ওকে। 'উত্তর দিতেই হবে আপনাকে। কে নিয়ে গেছে রিতাকে, কোথায়?'

উত্তর নেই।

আবার জোর একটা ঝাঁকি দিতেই ঢলে পড়ল শিবানী। সত্যিই জ্ঞান হারিয়েছে, নাকি ভান করছে বুঝবার উপায় নেই। পড়ে যাবার আগেই ধরে ফেলল রানা ওকে। শুইয়ে দিল শোফায়। টেবিলের উপর একটা সাদা প্যাড দেখে এগিয়ে গেল।

বল পেন দিয়ে লেখা হয়েছিল চিঠিটা। নীচের কাগজের উপর দাগ পড়েছে স্পষ্ট। রানা পড়ল:

রিতা,

তোমার দাদার এক বন্ধু এসেছেন ঢাকা থেকে। বিশেষ প্রয়োজনে তোমার সাথে তার দেখা হওয়া দরকার। এক্ষুণি। গাড়ী পাঠালাম। তোমার অপেক্ষায় বসে আছেন উনি। সুপারকে বলে সোজা বাসায় চলে এসো। আজ রাতটা বাসায় থাকবে সে কথা জানিয়ে এসো হোস্টেলে।

ইতি তোমার বৌদি—
শিবানী দত্ত।

আধ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে চিন্তা করল রানা। আপাদমস্তক দেখল শিবানীকে। কি আশ্চর্য রূপ, সেইসাথে কী আশ্চর্য মতিভ্রম! মাথা খারাপ মেয়েলোকটার। নিম্ফোম্যানিয়াক? নাকি স্রেফ বিকৃতরুচি শয়তান? কিসের ভয় পাচ্ছে ও? কারা চোখ রাঙাচ্ছে?

বেরিয়ে এল রানা দেবাশীষের বাড়ী থেকে। মনে পড়ল দেবাশীষ আর রিতার কুৎসিত সম্পর্কের ব্যাপারে শিবানীর মন্তব্য। কথাটা বলতে গিয়ে ঈর্ষায়, অপমানে আর ঘৃণায় অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল শিবানীর চেহারা। এর কতটুকু সত্য? কতটুকু মিথ্যা?

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে এপাশ ওপাশ চাইল রানা। প্রায় নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়াল একটা গাড়ী।

আট

'এবার কোনদিকে বস্?' গাড়ী ছেড়ে দিয়ে প্রশ্ন করল আসলাম।

'খেয়েছেন?'

'নাহ্। খাওয়া আর জুটলো কোথায়? সেই দুপুর থেকে ত কেবল ঘোড় দৌড় করছি। পেটের ভেতর ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়ে গেছে।'

'আমারো। চলুন কিছু খেয়ে নেয়া যাক। অনেক কথা আছে।' একটা মোড়ে এসে বলল রানা, 'এবার বাঁয়ে যান। সেলিম হোটেলে খেয়ে নেব।'

'সেলিম হোটেল? অনেক টাকা বিল হবে।'

'হোক।'

একটা কোণা বেছে নিল ওরা। খাবারের অর্ডার দিয়ে দুজন দুটো সিগারেট ধরিয়ে মুখোমুখি হল পরস্পরের। মৃদু হাসল রানা। 'আপনার কথা শুনি আগে।'

'আমার বিশেষ কিছু কথা নেই বস্। নওয়াপাড়া, অভয়নগর, ফুলতলা, সিদ্ধিপাশা ছাড়িয়ে খুলনা আসার পথে শিরোমনী-আটরার কাছাকাছি, যেখানটায় ঘোর যুদ্ধ

হয়েছিল ডিসেম্বরে, সেখানে বাম দিকে চলে গেছে একটা রাস্তা। সেই রাস্তায় কিছুদূর গেলেই ধুলোর পথ শুরু হয়েছে। আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে আধমাইল গিয়ে আম-বাগান ঘেরা একটা পোড়ো মত বাড়ী আছে। খুব সম্ভব যুদ্ধবিধ্বস্ত কোন মিল বা কারখানা। মরিস মাইনর গিয়ে ঢুকেছে সেখানে। ব্যাস, আর কোন খবর নেই। আধঘণ্টা অপেক্ষা করে ফিরে এলাম। আপনার এদিকে গরম খবর কি ?'

রানা সংক্ষেপে বলল সব ঘটনা। সবশেষে জিজ্ঞেস করল, 'এ থেকে আপনার কি মনে হচ্ছে ?'

'মনে হচ্ছে, প্রথম কাজ এখন রিতা দত্তকে উদ্ধার করা।'

'কাজের কথা বলছি না। সব শুনে কি মনে হচ্ছে আপনার ?'

'মনে হচ্ছে মরীচিকার পেছনে ছুটছি আমরা। কেন কি ঘটছে ঠিকমত না বুঝেই। আপনি কতদূর কি বুঝলেন জানি না, আমি নিজে অন্ধকার হাতড়াচ্ছি এখনো।'

দেবাশীষের মানি ব্যাগটা বের করে দিল রানা আসলামের হাতে। 'দেখুন, আলোর সন্ধান পেয়ে যেতে পারেন।'

ব্যাগের প্রত্যেকটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে হতাশ হয়ে গেল আসলাম।

'না ওস্তাদ। এই মাথায় কুলালো না।'

'বাংলাদেশের একশো টাকার নোটগুলো আবার একবার পরীক্ষা করে দেখুন।'

'দুটোই ভারতে ছাপা। এবং নতুন। একশোবার পরীক্ষা করলেও এর বেশী কিছু বলতে পরব না, বস্। দোহাই আপনার, অভাগাকে আর কষ্ট না দিয়ে একটু আলো দেখিয়ে দিন।'

'লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, নোট দুটোতে স্ট্যাপলের ফুটো নেই।'

'ওফ্!' চোখমুখ করুণ হয়ে উঠল আসলামের। 'এই দুঃসংবাদে কলজেটা আমার ফেটে যাচ্ছে বস্, কিন্তু কেন দুঃখ লাগছে বুঝতে পারছি না। ফুটোর অভাবে আমাদের কি সর্বনাশটা হয়ে যাচ্ছে একটু বুঝিয়ে বলুন।' প্লেট সাজিয়ে দিয়ে গেল বেয়ারা। 'আপনি আশা করছেন ইশারাই আমার জন্যে কাফি, মুখ থেকে বেরুবার আগেই বুঝে ফেলব সব কথা। ভুল। আসলে টাকা পয়সার ব্যাপারে আমার বিশেষ ধারণা নেই—জীবনে খুব অল্পই দেখেছি ও জিনিস।'

হাসল রানা। চিকেন বিরিয়ানি, চিকেন রোস্ট, মাটন কোর্মা, রেযালা, টিকিয়া, সালাদ, আর দুই গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গেল বেয়ারা। কান পর্যন্ত হাসল আসলাম সারাদিন পর চমৎকার ডিশের বহর দেখে। চটপট খানিকটা প্লেটে তুলে নিয়ে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করল কাঁটা চামচ আর ছুরি নিয়ে। মিনিট তিনেক সময় দিল রানা ওকে ক্ষুধার প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নেয়ার জন্যে, তারপর মুখ খুলল।

'কয়েকটা তথ্য দিচ্ছি, মিলিয়ে দেখুন ত কোন অর্থ বের করা যায় কিনা ?'

'কিসের কথা বলছেন বস্ ? ওহ্-হো, মনে পড়েছে। খাবার দেখে সব ভুলে গিয়েছিলাম। একশো টাকার নোটের কথা বলছিলেন। বলুন। কিন্তু খুলে বলুন দয়া করে। ব্রেনটাকে খাটুনি খাটিয়ে কোনদিন কষ্ট দিইনি আমি জীবনে, আমার ওপর অত্যাচার করবেন না। প্লিজ !'

'প্রথম তথ্য, প্রতিটা একশো টাকার নোটের গায়ে স্ট্যাপল পিনের দুটো ফুটো দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই দুটো নোটে ফুটো নেই। দ্বিতীয় তথ্য, বর্ডারে যে স্যুটকেস দুটো আজ পাচার করলাম তার ভেতর রয়েছে ফাইন গ্রেড কাগজ, আমার যতদূর বিশ্বাস পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে ওগুলো নোটের কাগজ। তৃতীয় তথ্য, যে বনোয়ারীলাল ঝুনঝুনওয়ালার ওপর ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের চোখ আছে, সেই লোকটার একখানা পেপার মিল আছে। চতুর্থ তথ্য, ভাটপাড়ার ছাপাখানায় 'মুসলিম বাংলা'র প্রচার পত্র পাওয়া গিয়েছে। পঞ্চম তথ্য, শত্রুপক্ষ যা খুঁজছে সেটা বড়সড় কিছু জিনিস না, স্যুটকেসের পকেটে বা ব্রিফ কেসে রাখা যায় এমন কোন জিনিস। এবার বলুন, কি বুঝলেন ?'

খাওয়া বন্ধ করে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে ছিল এতক্ষণ আসলাম রানার মুখের দিকে, কথা শেষ হতেই ফোঁশ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'সর্বনাশ ! এ তো ভয়ানক ব্যাপার মনে হচ্ছে।' খানিকক্ষণ এক মনে খাবার পর আবার চোখ

তুলল, 'তলে তলে সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে, আর আমরা বসে বসে পোলাও-কোর্মা খাচ্ছি?' খাওয়া বন্ধ করবার উপক্রম করল আসলাম।

'পোলও-কোর্মা খাওয়ায় দোষ নেই। খেয়ে নিন। কে জানে এটাই আমাদের জীবনের শেষ খাওয়া কিনা?'

'কিছু একটা করতে হবে না?'

'কার বিরুদ্ধে কিছু একটা করবেন? কে সে?'

'তাইতো! কার বিরুদ্ধে লাগব তাইতো জানি না।' আবার খেতে শুরু করল আসলাম। কয়েক গ্রাস খেয়ে নিয়ে বলল, 'আপনি বলতে চাইছেন একদল ভারতীয় দুষ্কৃতকারী যোগ দিয়েছে একদল বাংলাদেশী দুষ্কৃতকারীর সাথে, তারা একশো টাকা নোটের প্লেট চুরি করেছে অথবা তৈরী করেছে, প্রতি সপ্তাহে দুই স্যুটকেস করে কাগজ এসেছে বাংলাদেশে বনোয়ারীলালের পেপার মিল থেকে, টাকা ছেপে বাজার ছেয়ে ফেলবার মতলব করেছে ওরা, কিছুসংখ্যক পাকিস্তানী দালাল সাহায্য করছে ওদের, ছাপা টাকা পাচার করা বিপদজনক, তাই কাগজ এনে ছাপা হচ্ছে বাংলাদেশেরই কোথাও—বুঝলাম। কিন্তু এর মধ্যে দেবাশীষ দত্ত কেন?'

'কাস্টম্সের লোকজনের সাথে ভাল জানাশোনা ছিল দেবাশীষের। তাছাড়া অত্যন্ত প্রভাবশালী লোক সে এই অঞ্চলের। ওর স্যুটকেস সার্চ করা হবে না জেনেই কৌশলে বাধ্য করেছিল ওরা দেবাশীষকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে।

আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, আসলে ওরা ফাঁদে ফেলেনি দেবাশীষকে, দেবাশীষই জাল পেতেছিল ওদের জন্যে। বর্ডার ক্রস করার এই সুবিধার কথা হয়তো দেবাশীষই জানিয়েছিল ওদের কথার ছলে। ওদিকে ঢাকায় খবর দিয়েছিল, যেন ওর মাল সার্চ করা না হয় বনগাঁ-বেনাপোল বর্ডারে তার ব্যবস্থা করার জন্যে। ওরা দেবাশীষকে লুফে নিয়েছে।'

'মারল কেন ওকে?'

'খুবসম্ভব নোট ছাপার প্লেট নিয়ে ভেগেছিল দেবাশীষ।' সিগারেট বের করল রানা। 'কিন্তু ওকে মেরেছে রাজেশ মল্লিক। এরা না। এরা হলে আজকের স্মাগলিংটা হত না।'

মাথা ঝাঁকাল আসলাম। খাওয়া দাওয়ার পর কফি এল। বিল নিয়ে আসতে বলল রানা।

'এখন আমাদের কি কর্তব্য?'

রানা জানে আজই রাতে যেতে হবে ওকে আটরায়, শত্রুপক্ষের গোপন আস্তানায়। কিন্তু একা যেতে চায় ও। বলল, 'অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। ছেঁড়া কাগজ দেখতে পাবে ওরা, স্যুটকেসের ভেতর প্লেট পাবে না। কাজেই তেড়ে আসবে ওরা আমার পিছনে। যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

বিল পেয়ে টাকা দিতে যাচ্ছিল রানা, বেয়ারার সামনেই বাধা দিল আসলাম।

'ঐ টাকা দেবেন না বস্। নতুন নোট দুটোর একটা দেন, নকল হলে ধরা পড়বে ক্যাশিয়ারের কাছে। তাঁদোড় লোক। সন্দেহ যখন আছে, দেখা যাক পরীক্ষা করে।'

বেয়ারার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। আসলামের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে স্ট্যাপল্-বিহীন একটা একশো টাকার নোট রাখল রানা তস্তরীর উপর। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওদের দুজনকে দেখল বেয়ারা আবক্ষমস্তক। দ্রুত পায়ে তস্তরী নিয়ে চলে গেল ক্যাশ কাউন্টারের দিকে। ক্যাশিয়ারের কানে কানে কিছু একটা হুঁশিয়ারী সংকেত দিচ্ছে বেয়ারা। হাসল ওরা দুজন।

আসলাম বলল, 'রিতা দত্তকে উদ্ধারের ব্যাপারে কি করবেন?'

কাউন্টারের দিকে চেয়ে রানা বলল, 'আপাততঃ কিছুই না?'

ভাল মত পরীক্ষা করে দেখল ক্যাশিয়ার নোটটা। সাদা কাগজের উপর বিছিয়ে দেখল, এপিঠ ওপিঠ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে দেখল, শেষ পর্যন্ত একটা কোণা পানিতে ডুবিয়ে দেখল কালিটা পাকা কিনা—তারপর ড্রয়ারে রেখে কি যেন বলল বেয়ারাকে, হাসি ফুটল বেয়ারার মুখে।

'এতে কি প্রমাণ হয় ওস্তাদ?'

'হয় আসল, নয়তো খুবই পাকা হাতের নকল। যাকগে, আমি এখন উঠব। আপনি এই হোটেলেই থেকে যান রাতটা।'

'অলরাইট। আপনাকে আপনার হোটেলে ছেড়ে দিয়ে আসি আগে।' রানাকে আপত্তির ভংগি করতে দেখে বলল, 'বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, বস্। আপনাকে শাহীন হোটেলে ছেড়ে দিয়ে অসতে আমার পনের মিনিটের বেশি লাগবে না।'

রানা বুঝল, রানার উপর আক্রমণ আসতে পারে টের পেয়ে ওকে একা ছাড়তে চাইছে না আসলাম। ছেলেটাকে বেশ ভাল লেগে গেছে রানার। নিজে গম্ভীর মানুষ, কিন্তু এরকম প্রাণবন্ত মানুষই ওর পছন্দ। আপত্তি করল না। বেয়ারাকে মোটা বখশিশ দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা বাইরে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখন শুধু টিপ টিপ করে ঝরছে হাল্কাভাবে। রাস্তার ঘোলা পানি উচ্ছল ভঙ্গিতে ছুটেছে ড্রেনের দিকে।

গাড়ীটা চালু হতেই একরাশ পানির ঢল নামল ছাদ থেকে উইণ্ডশিল্ডের উপর। ওয়াইপার চালু করে দিয়ে রওনা হল আসলাম। পাশের সীটে রানা। বৃষ্টির ফলে জনশূন্য হয়ে গেছে রাস্তা। তাছাড়া রাতও হয়েছে। চুপচাপ গাড়ী চালাচ্ছে আসলাম। গভীর চিন্তায় মগ্ন দুজনই।

খান জাহান আলী রোড ধরে কিছুদূর যাওয়ার পরই একটা মোড়ের কাছে এসে হঠাৎ ওভারটেক করল পিছনের গাড়ীটা। হঠাৎ বাঁয়ে স্টিয়ারিং কেটে ব্রেক করল জোরে। রাস্তার উপর আড়াআড়ি ভাবে থেমে গেল সাত-আট হাত স্কিড করে।

ব্রেক করল আসলাম। ভেজা ঘাসের উপর পিছলে এগিয়ে গেল গাড়ীটা কয়েক হাত। বাম চাকা দুটো চলে গেছে পাশের খাদে। ডান দিকে কাত হল রানা, কিন্তু কাজ হল না। এক সেকেণ্ড থমকে থাকল গাড়ীটা বেকায়দা ভংগিতে, যেন ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করছে, তারপর ধীরে ধীরে, মাধ্যাকর্ষণের অমোঘ টানে ঢলে পড়ল বাম দিকে। দুই গড়ান দিয়ে ধপাশ করে কাদায় পড়ল চিৎ হয়ে। বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। হেড লাইট দুটো জ্বলছে শুধু। চুপচাপ।

শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করবার জন্যে পাগলের মত টানাটানি করছে আসলাম। রানার পিস্তল বেরিয়ে এসেছে আগেই, দরজা খোলার চেষ্টা করছে সে এখন। বাতি নিভিয়ে দিয়েছে কনসাল কর্টিনা। করোনার আলোয় দেখতে পেল রানা, তিনজন নেমে আসছে কর্টিনা থেকে। তিনজনের হাতেই পিস্তল। এটা পিস্তল থেকে গুলি বেরোল দুটো, অন্ধ হয়ে গেল করোনা ডিলাক্স।

দরজা খোলা গেল না। দুজন দুই জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল। সামনের চাকার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল আসলাম, রানা পজিশন নিল গাড়ীর পিছনে।

উপর থেকে একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'হ্যাণ্ডস আপ। মাথার উপর হাত তুলে উঠে এসো উপরে। কোন রকম শয়তানী করলেই গুলি খাবে।

'শুয়োরের বাচ্চা!' গালি এবং গুলি একই সাথে বর্ষণ

করল আসলাম। অন্ধকারে ঘোঁত করে উঠল কেউ, পরমুহূর্তে ছুটে এল একঝাঁক গুলি। কয়েক পা সরে গেল রানা। সরে গেছে আক্রমণকারীরাও। পনের সেকেণ্ড চুপচাপ কাটল। বেশ কিছুটা পিছনে একটা ছায়ামূর্তি দেখা গেল এবার। পরপর দুটো গুলি করল রানা। ধড়াশ করে পড়ল ছায়ামূর্তি, চিৎকার করে উঠল আকাশ বাতাস ফাটিয়ে। কর্টিনার বনেটের আড়ালে বসে অনর্গল গুলি করছে একজন। পর পর তিনটে গুলি করল রানা ওর হাত লক্ষ্য করে। কেঁউ করে লাথি খাওয়া কুকুরের ডাক ডেকে উঠেই গুলি বন্ধ করল লোকটা। আর তিনটে গুলি আছে রানার পিস্তলে। বৃষ্টির মত গোটা বিশেক গুলি এসে পড়ল আশে পাশে। আরো পিছিয়ে গেল রানা।

আরো তিনটে ছায়া নড়ে উঠতে দেখল রানা। অন্ধকারেও বোঝা গেল ওদের হাতে পিস্তল নয়—ষ্টেনগান। ভয় পেল রানা। দুজন ছড়িয়ে পড়ছে দুইপাশে, একজন নেমে আসছে হামাগুড়ি দিয়ে। আসলামের কাছাকাছি। কিন্তু গুলি করতে দেরী করছে কেন আসলাম, বিকল হয়ে গেল নাকি ওর পিস্তলটা?

'আসলাম, বাম দিকেরটা আপনি, ডানদিকেরটা আমি।' বলেই গুলি করল রানা। লক্ষ্যভ্রষ্ট হল গুলিটা। আসলামের তরফ থেকে কোন সাড়া নেই। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে ছায়ামূর্তি। বেশ অনেকটা দূরে, তবু গুলি করল রানা। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে তিন

লাফে চলে গেল লোকটা রাস্তার উপর নিরাপদ দূরত্বে। প্রায় চল্লিশ গজ দূরে রাস্তা থেকে ডিচে নামছে একজন। কড়কড় করে গর্জে উঠল ওর হাতের স্টেনগান। প্রমাদ গুণল রানা। আর একটা মাত্র গুলি আছে ওর পিস্তলে।

'কি হল, আসলাম? কি হল আপনার? পিস্তল জাম হয়ে গেছে?'

জবাব এলো স্টেনগানের গুলিতে। আসলাম চুপ। শেষ গুলিটা খরচ করল রানা স্টেনগানধারীর উদ্দেশ্যে। আবার এল ব্রাশ ফায়ার। আর রক্ষা নেই! রানার পিছন থেকে গুলি শুরু করল এবার দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি। ঠিক এমনি সময় দূর থেকে একটা গাড়ীর ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল রানা। ছায়ামূর্তিরাও শুনতে পেয়েছে শব্দটা। হঠাৎ রণে ভঙ্গ দিয়ে কর্টিনার দিকে ছুটল ওরা। সেই সাথে অবিশ্রাম গুলি চালাচ্ছে করোনার দিকে। পেট্রল ট্যাংকে ঢুকল একটা গুলি। ছোট্ট একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল, পরমুহূর্তে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। র‍্যাডিয়েটারের গায়ে পিছলে রানার বগলের নীচে দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা গুলি। গাড়ীতে উঠে পড়েছে ছায়ামূর্তিগুলো।

আর দেরি করা যায় না। তিন লাফে চলে এল রানা করোনার সামনের চাকার কাছে। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে আসলাম। গুলি বন্ধ হয়ে গেছে। আড় চোখে চাইল রানা। কনসাল কর্টিনার দিকে। ব্যাক করে

গাড়ীটা সোজা করেই নিয়েই সাঁ করে বেরিয়ে গেল সেটা। পিছনের গাড়ীটা একেবারে কাছে চলে এসেছে, হেড লাইটের আলোয় কনসালের নাম্বার-প্লেটটা দেখে নিল রানা চট করে, তারপর আসলামকে টেনে নিয়ে সরে গেল খানিকটা তফাতে। দাউ দাউ করে জ্বলছে এখন করোনা ডিলাক্স মশালের মত। মাথার উপরে ঘ্যাঁচ করে থামল একটা ভকসল ভিভা।

নিরাপদ দুরত্বে সরে গিয়েই চাইল রানা আসলামের মুখের দিকে। পরমুহূর্তে ওকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই আসলামের। কপালের ঠিক মাঝখানে লেগেছিল গুলিটা, সরু একটা রক্তের ধারা নেমে এসেছে নাকের পাশ দিয়ে চিবুক পর্যন্ত।

ভকসল ভিভার আরোহী ভদ্রলোক নেমে এসে দাঁড়িয়েছে খাদের পাশে। জ্বলন্ত গাড়ীর আলোয় আসলামের কপালের দিকে চেয়েই চোখ জোড়া কপালে উঠল তার। পিস্তল হাতে বিধ্বস্ত চেহারার রানাকে উপরে উঠে আসতে দেখে ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল ভদ্রলোকের, বিড় বিড় করে কি যেন বলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ীর দরজার উপর।

রানা রাস্তায় উঠে আসবার আগেই গাড়ী স্টার্ট দিয়ে গিয়ার দিয়ে ফেলেছে ভদ্রলোক। পথ আগলে দাঁড়াল রানা। চলতে শুরু করেছে ভকসল ভিভা। ক্রমেই স্পীড বাড়ছে। রানা প্রস্তুত হল লাফ দেয়ার জন্যে, থামবার

লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না লোকটার মধ্যে। গাড়ীটা হাত দুয়েক থাকতেই লাফ দিল রানা উপর দিকে। হাঁটুর নীচে ধাক্কা লাগল, হুড়মুড় করে পড়ল সে বনেটের উপর। এক ফুট দূরে উইণ্ডশীল্ডের ওপাশে ভীত সন্ত্রস্ত মুখ দেখা যাচ্ছে লোকটার। গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল রানা, একটা ওয়াইপার চেপে ধরে কোনমতে টিকে গেল।

আরেকটা গাড়ী আসছে পিছন থেকে। মোড় ঘুরছে। পিস্তলটা ধরল রানা কাচের এপাশ থেকে চালকের চোখ লক্ষ্য করে। চিৎকার করে বলল, 'থামাও গাড়ী!'

জ্বলন্ত গাড়ীর ত্রিশ গজের মধ্যে থেমে দাঁড়াল ভকসল। ওদিকে প্রাণপণে ব্রেক কষেছে পিছনের গাড়ীটা আগুণ দেখে। বনেট থেকে নেমেই ইংগিত করল রানা ড্রাইভারকে পাশের সীটে সরে যাবার জন্যে। ভয়ে লোকটা কিছুই বুঝতে পারছে না দেখে বলল, 'সরে যান পাশের সীটে।'

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা। পিছন ফিরে দেখল, পিছনের গাড়ীর আরোহী গাড়ী থেকে নেমে ছুটে গেল খাদের কিনারে। ভকসলের গিয়ার দিয়েই টের পেল দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে যাওয়ার প্ল্যান করেছে পাশের ভদ্রলোক। এক হাতে কোট খামচে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা, সেইসাথে এ্যাকসিলারেটার টিপে ধরে ক্লাচ ছাড়ল। লাফিয়ে এগোল গাড়ীটা সামনের দিকে, দড়াম করে লেগে গেল খোলা দরজা, রানার গায়ের উপর

হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভদ্রলোক।

কনুই দিয়ে ঠেলে লোকটাকে সোজা করে দিয়ে বলল রানা, 'ভয় নেই। আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আমি হাইজ্যাকার নই। সামনের গাড়ীতে করে পালাচ্ছে একদল লোক আমার বন্ধুকে খুন করে রেখে। ওদের পিছু ধাওয়া করতে হবে। ওদের ধরতে পারলেই আপনাকে ছেড়ে দেব গাড়ীসহ।'

কোন কথা বলল না পাশের লোকটা। একটা মোড় ঘুরতেই জ্বলন্ত গাড়ীর দৃশ্যটা মিলিয়ে গেল। যশোর রোড ধরে চলেছে ওরা। মোটামুটি জানাই আছে রানার কোথায় যেতে হবে, তবু সাইড লেনগুলোতে চাকার দাগ পরীক্ষা করতে করতে চলল সে। মাইল পাঁচেক গিয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হল রানা, আসলামের বর্ণিত আটরার সেই আড্ডার দিকেই গেছে ওরা যতদূর সম্ভব। চিনে বের করা খুব কঠিন হবে না। ফুল স্পীডে ছুটল ভকসল ভিভা যশোর রোড ধরে।

একটা সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে আরেকটা এগিয়ে ধরল রানা পাশের ভদ্রলোকের দিকে।

মাথা নাড়ল ভদ্রলোক। খাবে না, বা খায় না।

নয়

'কোনদিকে চলেছিলেন?' সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল রানা।

চুপচাপ গোঁজ হয়ে বসে রইল ভদ্রলোক, নিরুত্তর। হাসল রানা।

'পিস্তল দেখেই আপনার ভয় বা রাগ তো?' বলল রানা। 'নিন, ধরুন এটা।' পিস্তলটা গুঁজে দিল রানা লোকটার হাতে। 'ব্যাস, আর ভয়ের কিছুই নেই। কি বলেন? এবার সহজ হয়ে বসুন। বেশ অনেকটা পথ যেতে হবে আমাদের, ওরকম আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকলে ব্যথা হয়ে যাবে পিঠ।'

অবাক চোখে পিস্তলটা দেখল ভদ্রলোক উল্টেপাল্টে, বার কয়েক একবার রানার মুখ, একবার পিস্তলের দিকে চাইল, তবু বুঝে উঠতে পারল না ব্যাপারটা। শেষ পর্যন্ত হাসল।

'শুধু পিস্তল নয়, আপনার চেহারাটাও ভয়ংকর।'

'এ ব্যাপারে আমার হাত নেই ভাই, এটা খোদার হাত। ঐ রকম করেই বানিয়েছে আমাকে।'

'ওখানটায় কি গোলাগুলি চলছিল ?'

'হ্যাঁ। স্টেন আর পিস্তল নিয়ে আক্রমণ করেছিল ওরা আমাদের।'

'আপনারা কি পুলিশের লোক ?'

'ঠিক পুলিশের লোক বলা যায় না···তবে কাছাকাছিই।'

'যাই হোক, জোর করে আমার গাড়ী ব্যবহার করবার কোন অধিকার আপনার নেই।'

'অধিকার নেই ঠিক। কিন্তু এটা আপনার নাগরিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য দোষ আপনার নয়, খাকি ড্রেস দেখলে স্বেচ্ছায় আপনার গাড়ী ব্যবহার করতে দিতেন আপনি, কেউ রাস্তায় জখম হলে স্বেচ্ছায় হাসপাতালে পৌঁছে দিতেন আপনি বিনা দ্বিধায়—দোষ আমার চেহারার। যাই হোক আমি আটরার দিকে যাচ্ছি, আপনার খুবই অসুবিধে করলাম বোধহয় ?'

'না। আমি যাচ্ছিলাম অভয়নগরে। আমার নাম সাইদুর রহমান। গিয়েছিলাম খুলনা ক্লাবে। অভয় জুট মিলের আমি এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার। আপনি···'

'আমার নাম মাসুদ রানা। পেশাটা গোপন রাখতে হচ্ছে, দুঃখিত।'

রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়েই চলেছে, কখনও ঝরঝরিয়ে নামছে এক-আধ পশলা। এই বাদলার দিনে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া গাড়ী নিয়েও বেরোয় না লোক। মাঝে মধ্যে একটা দুটো লরী,

বাস বা প্রাইভেট কার আসছে যশোরের দিক থেকে, সাঁ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে একশো বিশ মাইল বেগে। খালিশপুর পেরিয়ে এল ওরা। দৌলতপুরের কাছাকাছি এসে আবার কথা বলে উঠল সাইদুর রহমান।

'এবার যদি পিস্তল দেখিয়ে আপনাকে গাড়ী থামাতে বাধ্য করি ?'

'পিস্তল দেখাতে পারেন, কিন্তু গাড়ী থামাতে পারবেন না,' বলল রানা।

'কেন ? পিস্তল দেখালে নিশ্চয়ই আপনি গাড়ী থামাতে বাধ্য।'

'না। থামবই না আমি। প্রথম কথা, পিস্তল দেখান আর গুলি করা দুটো আলাদা জিনিস—সবাই অবলীলায় মানুষ খুন করতে পারে না। ট্রিগার টেপার সাহস আপনার হবে না। দ্বিতীয়তঃ, আমাকে গুলি করলে গাড়ীটা এ্যাকসিডেন্ট করবো, এত স্পীডে এ্যাকসিডেন্ট করলে আপনি মারাও যেতে পারেন। সেই ভয়ে গুলি ছুঁড়তে পারবেন না আপনি। আর তৃতীয়তঃ, গুলি নেই ঐ পিস্তলে। ওটা এখন একটা খেলনা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'ধোকা দেয়ার চেষ্টা করছেন।'

'বাইরের দিকে তাক করে টিপে দেখুন না।'

ক্লিক করে শব্দ হল শুধু, গুলি বেরোল না। গম্ভীর হয়ে বসে রইল সাইদুর রহমান। হেসে উঠল রানা।

'কাজেই আপনাকে মোগলের সাথে খানা খেতেই হচ্ছে।'

'আপনি খালি পিস্তল দিয়ে ভয় দেখিয়েছিলেন আমাকে!' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল সাইদুর রহমান, 'ব্যাপারটা না জানলেই ভাল ছিল। অন্ততঃ বাড়ী ফিরে স্ত্রীর কাছে ভয়ংকর এক হাইজ্যাকারের গল্প বলে পার পেতাম তাহলে। এখন আর কোন ছুতো রইল না আমার রাত করার। সবটা ব্যাপার চেপে যেতে হবে আমাকে বেমালুম। খালি পিস্তলের গল্প বাড়ী গিয়ে বললে টিটকারীর ঠেলায় দেশ ছাড়তে হবে আমাকে।'

'মিথ্যে বানিয়ে বললেই হল?' বলল রানা।

'অল্পদিন হল বিয়ে হয়েছে আমাদের। মিথ্যেটা চালু হয়নি এখনো। ঠিক কথাই বলতে হবে যদি বলি।'

'চেপে যাওয়াটা বুঝি মিথ্যের মধ্যে পড়ে না?'

'না। সত্য গোপন আর মিথ্যা কি এক হল? দুটো দুই জিনিস।'

চুপচাপ কেটে গেল অনেকক্ষণ।

হঠাৎ এ্যাকসিলারেটার থেকে পা তুলে নিল রানা। একই সাথে দেখল দুজন কনসাল কর্টিনাটাকে। ওদিক থেকে আসা একটা গাড়ীর হেড লাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল, বাঁক ঘুরছে গাড়ীটা আধ মাইল দূরে। আস্তানার কাছাকাছি এসে গেছে বলে অস্বাভাবিক পলায়নী গতিটা নেই আর ওটার, নিশ্চিন্ত গতিতে

চলেছে অন্ধকার কেটে। হেড লাইট নিভিয়ে দিল রানা। উশখুশ শুরু করল সাইত্বর রহমান।

'কিভাবে কি করবেন ভাবছেন?' বলল সে, 'আক্রমণ করবেন ওদের?'

'ঘাবড়াবেন না। আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে কিছুই করব না।'

নিঃশব্দে কাটল পাঁচ মিনিট। আধ মাইল দূরের গোল ত্নটো টেইল লাইট যশোর রোড ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ডানদিকের একটা গলিতে। মিনিট ত্নয়েক পর গলিমুখে পৌঁছল ভকসল ভিভা। চাকার দাগটা পরীক্ষা করে নিয়ে রওনা হল রানা আঁকাবাঁকা গলি দিয়ে। সাইড-লাইটের আবছা ম্লান আলোয় সামনের তিন-চার গজ দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট ভাবে, গর্ত বাঁচিয়ে সাবধানে এগোল সে ধীরে ধীরে। আধ মাইল গিয়েই শুরু হল কাঁচা রাস্তা বৃষ্টির ফলে পিচ্ছিল। পিছলে যাচ্ছে গাড়ীর চাকা। ত্নই পাশে খাদ. রাস্তা ছেড়ে ঐদিকে যাওয়ারই প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে গাড়ীটার। আসলে চাকার থে্রডগুলো কাদাভর্তি হয়ে গিয়ে মসৃণ, পিচ্ছিল হয়ে গেছে। ব্রেক করলেও কথা শোনে না। একমাত্র ভরসা গাড়ীর ওজনটা। এখন আর ধারে কাটছে না, ভারে কাটছে। ওজনের জোরেই চাকাগুলোকে তাও কিছুটা বাধ্য রাখা গেছে। মোটর সাইকেল হলে এতক্ষণে সড়াৎ-ধুম হয়ে যেত নির্ঘাৎ। চাকার উপর ভর না করে শুধু আল্লার

উপর ভর করে এগোল রানা।

খানিকটা ঢালু জায়গা পিছলে নেমে এসে অপেক্ষাকৃত ভাল রাস্তা পাওয়া গেল। খাদ নেই আর। ডানপাশে একটা জুট মিলের গেট। আরো এগিয়ে গেল চাকার দাগ অনুসরণ করে। রাস্তার বাম পাশে একটা উঁচু দেয়াল দেখে আরো ধীর করল রানা গাড়ীর গতি। নিভিয়ে দিল সাইড লাইট। আমবাগান দেখা যাচ্ছে দেয়ালের ওপাশে। প্রাচীর শেষ হতেই ব্রেক করল রানা। রাস্তাটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে এইখানে। একটা সোজা গিয়ে পঞ্চাশ গজ দূরের ভৈরব নদীতে মিশেছে—এই নদীই আরো দক্ষিণে গিয়ে রূপসা হয়ে গেছে। বামের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে কনসাল কর্টিনা। মনে হচ্ছে দেয়ালের গায়ে নাক ঠেকিয়ে গন্ধ শুঁকছে প্রকাণ্ড এক জন্তু। বোঝা গেল ওটা গেট। একজন গাড়ী থেকে নেমে কি যেন করছে গেটের কাছে। বাড়ীর ভিতরের দিকে গেটের কাছাকাছি গর্জন করছে একটা কুকুর ভারি গলায়। গলার আওয়াজ শুনেই বোঝা যাচ্ছে, বিদেশী কোন ভয়ংকর মাল। ধীরে ধীরে পিছিয়ে এল রানা কয়েক গজ।

'কি করতে যাচ্ছেন?' ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল এ্যাডমিনিস্ট্রেটার। গলাটা কেঁপে গেল।

'দেয়াল টপকাব।' কুকুরটা ওদিকে ব্যস্ত থাকতে থাকতেই ভেতরে ঢুকে পড়তে হবে আমার।'

'আর আমি?'

'আপনি গাড়ীটা ব্যাক করে নিয়ে সোজা কেটে পড়ুন।' পিস্তলটা নিল রানা সাইত্বর রহমানের হাত থেকে। আস্তে করে হ্যাণ্ডেলে চাপ দিয়ে নিঃশব্দে খুলল দরজা।

কোটের হাতা খামচে ধরল সাইত্বর রহমান। 'ঐ খালি পিস্তল দিয়ে কি করবেন আপনি এতগুলো সশস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে?'

'দেখি। যতটা পারা যায় চেষ্টা করে দেখতেই হবে। নইলে খুন হয়ে যাবে আরেকজন।' হাসল রানা: 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার পেট্রলের খরচাটা দিয়ে দিই?'

'নো, থ্যাংকিউ। আমি কোন সাহায্যে আসতে পারি?'

উঁচু দেয়ালের দিকে চেয়ে রানা বলল, 'গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিয়ে দেয়াল ঘেঁষে যদি রাখতে পারেন তাহলে টপকাতে সুবিধে হবে আমার।'

'আর কিছু?'

'সম্ভব হলে থানায় একটু খবর দেবেন। যদি ওদের সাহসে কুলোয়, যেন সাহায্য করে আমাকে। লোকেশন ত জানাই আছে আপনার।' নেমে গেল রানা।

গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করাল সাইত্বর রহমান। কাদামাখা পা নিয়ে রানাকে গাড়ীর ছাতে উঠতে দেখে বলল, 'দিলেন ত গাড়ীটা একেবারে খতম করে! উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক। গুড নাইট।'

দেয়ালটা অরক্ষিত। কাচের টুকরো, কাঁটাতার, বা

ইলেকট্রিফায়েড ওয়ায়ারের কোন চিহ্ন নেই। লাফ দিল রানা। দুই হাতে ধরে ফেলল উপরটা, হাতের উপর চাপ দিয়ে উঠে শুয়ে পড়ল দেয়ালের উপর লম্বালম্বি ভাবে।

গেটের কাছে এখনো ধমক দিচ্ছে কুকুরটা রাত্রির অন্ধকারকে। গাড়ীর মৃদু গর্জন শুনে ঘাড় কাৎ করে দেখল রানা চলে যাচ্ছে ভকসল ভিভা। লাফিয়ে নামল নীচে।

আমের বোলের মিষ্টি মাতাল গন্ধ, টপটপ ফোঁটা, আর টিপটিপ বৃষ্টি, ভেজা ঘাস। দুটো জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। দ্রুত অথচ সন্তর্পণে এগোলো রানা। পাট বেলিং বা ঐ জাতীয় কোন ফ্যাক্টরী ছিল এটা একসময়। ফ্যাক্টরীর শেডের পাশেই ম্যানেজারের কোয়ার্টার। আলো আসছে সেই কোয়ার্টার থেকেই। বাগানের পর মাঠ, তারপর বাড়ীটা। মাঝামাঝি আসতেই থেমে গেল কুকুরের ডাক। প্রাণপণে দৌড় দিল রানা।

গাড়ী বারান্দায় ঘুরিয়ে রাখা হচ্ছে কনসাল কর্টিনা, হেড লাইটের আলো সার্চ লাইটের মত সারাটা মাঠের উপর চোখ বুলাতে বুলাতে এগিয়ে আসছে রানার দিকে। শুয়ে পড়ল রানা। মাথার উপর দিয়ে চলে গেল আলোটা। মাঠে জমে থাকা পানিতে চুপচুপে হয়ে ভিজে উঠে পড়ল রানা আবার। আর কয়েক গজ গেলেই মোটামুটি নিরাপদ জায়গায় পৌঁছতে পারবে।

দেওয়ালের পাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখল রানা দুজন লোককে ধরাধরি করে নামানো হচ্ছে গাড়ী থেকে। ওপাশে

দাঁড়িয়ে আছে মরিস মাইনরটা। কথাবার্তার আওয়াজ আসছে, কিন্তু কথা বোঝা যাচ্ছে না। বাড়ীর ভেতরে বেজে উঠল একটা বেল। এই গোলমালের মধ্যে যে করে হোক ঢুকে পড়তে হবে বাড়ীর ভিতর। পিছন দিকে চলে এলো রানা। সন্তর্পণে পা ফেলছে। কুকুরটা টের পেয়ে গেলেই সর্বনাশ।

পাইপ বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। দোতালার জানালায় খুব সম্ভব শিক নেই। আট হাত উঠেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে ঘরের ভিতর। স্কাই লাইটের ফাঁক দিয়ে আসছে শব্দ। রেগেমেগে ধমক দিচ্ছে একজন. মিনমিনে স্বরে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে অপরজন। চেষ্টা করেও ঘরের কাউকে দেখতে পেল না রানা।

'...বেশক্। যেমন করে হোক ধরে আনা উচিত ছিল। কালো গাড়ীটা নিয়ে যাও আবার। তোমরা চারজন। আজ রাত্রের মধ্যেই জিন্দা হোক, মুর্দা হোক, এখানে এনে হাজির করতেই হবে ওকে।'

তিন-চারজনের পায়ের শব্দ পেল রানা। উঠে গেল আরো উপরে। বাথরুমে কাচের জানালা। ভিতর থেকে বন্ধ। দোতালায় লোক আছে কিনা, কিম্বা কয়জন আছে বুঝবার উপায় নেই। তবু ঝুঁকিটা নিতেই হবে পিস্তলটা বের করল রানা। সামনের গাড়ী বারান্দায় স্টার্ট নিল মরিসের ইঞ্জিন। আবার ডাকতে শুরু করল কুকুরটা ঘেউ ঘেউ, ঘেউ ঘেউ ঘেউ! এই ডাকের সাথে ছন্দ মিলিয়ে

ছোট্ট একটা টোকা দিল রানা জানালার কাচে।

রানার মনে হল কাচ ভাঙার ঝন ঝন শব্দ ঢাকায় বসেও শুনতে পাবে লোকে। নীচতালার লোকেদের কথা শোনার জন্যে কান পাতল রানা। কিছুই শোনা যাচ্ছে না। পাগল হয়ে ডেকে চলেছে কুকুরটা। মরিসের মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তাছাড়া টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ।

ঘরের ভিতর কান পাতল। এদিক্ থেকেও কোন আওয়াজ নেই। আস্তে করে ভাঙা কাচের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে জানালার বল্টু খুলে ফেলল রানা। নিঃশব্দে প্রবেশ করল। মেঘলা আকাশের আবছা আলোয় পাশের ঘরে যাবার দরজা দেখা গেল। সেখানেও কান পেতে কোন শব্দ পাওয়া গেল না। খুব সাবধানে হ্যাণ্ডেলে চাপ দিল রানা। ডান হাতে পিস্তল। ওপাশটা অন্ধকার। বাম হাতে বেরিয়ে এল গ্যাস লাইটার। ঘরের কোণে খচমচ শব্দ শুনে বিদ্যুৎবেগে পিছু ফিরল রানা, সাঁৎ করে সরে গেল দুই পা।

গোঙানীর মত একটা শব্দ এল কানে। খট করে লাইটারটা জ্বালল রানা। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে রিতা দত্ত। হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে মেঝেতে। রানাকে এগোতে দেখে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরোল ওর গলা দিয়ে, গড়িয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

'রিতা! আমি মাসুদ রানা!' ফিসফিস করে বলল রানা।

বন্ধ হয়ে গেল ছটফটানি। জুতোর গোড়ালীতে লুকোন একটা ছোট্ট কুঠরী থেকে ছুরি বের করল রানা। ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে কেটে দিল হাত পায়ের বাঁধন। মুখের বাঁধন আলগা হতেই কি যেন বলতে যাচ্ছিল রিতা, মুখে হাত চাপা দিয়ে থামিয়ে দিল ওকে রানা। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কয়জন আছে এই বাড়ীতে?' লাইটার নিভিয়ে দিয়ে বলল, 'আস্তে কথা বল, আমি একা, পিস্তলে গুলি নেই।'

'চার-পাঁচজনের বেশি হবে না। আমাকে রেখেই দাদার গাড়ী নিয়ে আবার চলে গেছে ওরা আপনাকে ধরে আনার জন্যে। মোট ছিল দশ-এগারজন। তবে হিংস্র ভয়ংকর একটা লোক আছে এই বাড়ীতে। আমি ভেবেছিলাম সেই পিশাচটা এসেছে বুঝি মনিবের চোখ ফাঁকি দিয়ে।

'কি নাম ওর মনিবের?'

'আহমদ শফিক। কি একটা প্লেটের কথা জিজ্ঞেস করছিল আমাকে, উত্তর দিতে পারিনি দেখে চুল ধরে টেনে খুব মেরেছে আমাকে। তারপর আপনি না আসা পর্যন্ত হাত পা বেঁধে ফেলে রাখার হুকুম দিয়েছে।'

'কোন্ ঘরে তোমাকে জেরা করেছে?'

'নীচে। ড্রয়িং রুমে।'

'এখান থেকে বেরোবার পথ তোমার জানা আছে নিশ্চয়ই?'

'সিঁড়ি দিয়ে নেমে তিনটে ঘর পেরোলেই বাইরে বেরোবার দরজা…'

'গাড়ী চালাতে জানো?' রিতাকে মাথা নেড়ে সায় দিতে দেখে বলল, 'এখান থেকে বেরোবার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। যে চারজনের কথা বললে ওদের আমি ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করব অন্যদিকে, তুমি সেই ফাঁকে বেরিয়ে যাবে গাড়ী বারান্দায়। ওখানে তোমার দাদার গাড়ীটা রয়েছে। ইগনিশন কী নেই, কাজেই তার ছিঁড়ে কিভাবে গাড়ীটা চালু করবে বলে দিচ্ছি। মন দিয়ে শোন…'

'তার ছেঁড়াই আছে। গাড়ীটা একবার চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল গ্যারেজ থেকে হাইজ্যাকার ছোঁড়ারা। সাতদিন পর উদ্ধার করা হয়েছিল। ইগনিশন স্যুইচ পাওয়া যায়নি বলে আমরা ওদের কৌশলেই গাড়ীটা চালাতাম তার জোড়া দিয়ে।'

'ভেরি গুড। ওরা উপকারই করেছিল দেখা যাচ্ছে। এখান থেকেই বেরিয়েই একলাফে গাড়ীতে উঠে সোজা চলে যাবে বড় রাস্তায়।'

'আর আপনি?'

'দশ মিনিট অপেক্ষা করবে আমার জন্যে বড় রাস্তার ওপর। ঠিক দশ মিনিট। যদি এর মধ্যে আমি না আসি তাহলে আর আধ মিনিটও অপেক্ষা না করে সোজা চলে যাবে খুলনায়। খুলনা ক্লাবের সামনে গাড়ীটা রেখে হেঁটে

চলে যাবে শাহীন হোটেলে। এই নাও চাবী। চার-তালার সাতাশ নম্বর কামরা। দরজায় তালা লাগিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম দাও গিয়ে। চেন ত শাহীন হোটেল?'

'চিনি।'

'আমি ছাড়া আর কেউ হাজার ধাক্কা দিলেও খুলবে না দরজা। সকাল ন'টার মধ্যে আমি যদি না ফিরি, তাহলে ঢাকার একটা নম্বরে রিং করে সব জানাবে। ওখান থেকে যে নির্দেশ আসবে সেইমত চলবে। নম্বরটা মনে রাখার চেষ্টা কর—টু ডাব্‌ল্‌ ফাইভ ডাব্‌ল্‌ থ্রি টু।' রিতার হাতে মৃদু চাপ দিল রানা। 'পা টিপে এসো আমার পিছন পিছন।'

দরজার কাছে এসে পিছন থেকে কোটের হাতা ধরে টানল রিতা। পিছন ফিরল রানা।

'কি?'

'দশ মিনিটের ভেতর আপনি না এলে কি বুঝব ধরা পড়েছেন?'

মিথ্যেকথা বলতে একটু বাধল রানার। একটু থেমে দ্বিধাটা কাটিয়ে নিয়ে বলল, 'না। এমনও হতে পারে, তাড়া খেয়ে হয়তো নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে পালাতে হবে আমাকে। কোন্ দিকে ফাঁকা পাব, কোন দিক দিয়ে পালালে সুবিধে হবে বলা যায় না।'

'কি দরকার? এক সাথেই বেরোবার চেষ্টা করি না কেন আমরা? ধরা পড়লে একসাথেই ধরা পড়ব, যদি

বাঁচি তাহলে একসাথেই বাঁচব। একা পালাব না আমি প্রাণ নিয়ে। আমার জন্যে আপনি কেন শুধু শুধু প্রাণ দেবেন? কিছুতেই যাব না আমি আপনাকে ছাড়া।'

'বোকামী কর না রিতা। যা বলছি তাই কর। এক-জন একজন করে পালানতে অনেক সুবিধে আছে। তোমাকে এখান থেকে কোনভাবে বের করে দিতে পারলে আমার পক্ষে আশপাশটা দেখে নিয়ে পালান খুব সহজ হবে, তুমি সাথে থাকলে পদে পদে বাধা আসবে। কাজেই তোমাকে যা বলেছি ঠিক ঠিক যদি তা না কর, দুজনেরই বিপদ ডেকে আনবে তুমি। আমারো, তোমারো। বুঝেছ?'

মাথা নাড়ল রিতা। সব বুঝেছে। অনেক কাছে চলে এল। রানার একটা হাত তুলে নিল হাতে। থর থর করে কাঁপছে রিতা ভয়ে। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে, এসব ছেলেখেলা নয়, জীবন-মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। একটু এদিক ওদিক হলে মৃত্যু অবধারিত। ঘাড়ের পিছনে যমদূতের ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস অনুভব করতে পারছে যেন ও। আপনা-আপনি কাঁপছে সর্বশরীর।

ঠিক এই রকম চরম মুহূর্তে মানুষের সত্যিকার পরিচয় প্রকাশ পায়। বীরত্ব বা মহত্ত্বকে ফলাও করে দেখাবার, কিম্বা অভিনয় করবার সময় এটা নয়। ভিতরের সত্য রূপটা বেরিয়ে আসতেই হবে। স্থির, নিষ্কম্প, দুঃসাহসী লোকটা যে ওরই জন্যে এত বড় বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে, ওকে রক্ষা করবার জন্যেই যে আজ স্বেচ্ছায় মৃত্যুর মুখোমুখি

এসে দাঁড়িয়েছে—এটা বুঝতে পেরে অন্তরের অন্তঃস্থলে কোথায় যেন একটা আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে রিতার। অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছে রিতা। অদ্ভুত এক অনুভূতি।

লাইটারটা জ্বালল রানা। হাসল ওর ভুবনজয়ী স্মিত হাসি।

'ভয় নেই, রিতা। আসল বিপদ কল্পনার বিপদের চেয়ে অনেক কম ভয়ংকর। দেখবে, বিশ্বাসই হতে চাইবে না, এতই সহজে ঘটে যাবে সব ঘটনা। নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারবে তুমি এখান থেকে। চল, রওনা হই।'

চোখে চোখে চেয়ে রইল দুজন পাঁচ সেকেণ্ড। বুকের কাছে সেঁটে এল রিতা। ধীরে ধীরে নেমে এল রানার ঠোঁট রিতার অধরে। দুই হাতে জড়িয়ে ধরল রিতা রানার দৃঢ় পেশীবহুল পিঠ। সক্রিয় ভাবে সাড়া দিল রানার চুম্বনে। দশ সেকেণ্ড পর সরে গেল রানা। পাতলা সেলুলয়েডের টুকরোর সাহায্যে আধমিনিটের চেষ্টাতেই খুলে গেল দরজা। আলোকিত করিডোরে বেরিয়ে এল রিতা রানার পিছু পিছু।

মাঝ সিঁড়িতে নেমেই থমকে দাঁড়াল রানা। একাধিক পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, সিঁড়ির দিকেই আসছে কেউ। পা টিপে উঠে এলো ওরা আবার উপরে। লুকাল একটা অন্ধকার ছায়ায়। একজন আহত লোককে চ্যাংদোলা করে ধরে দোতালায় উঠে এলো দুজন লোক। বামদিকের দ্বিতীয় ঘরটায় ঢুকল। এক মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে এল আবার। সামনের লোকটার প্রকাণ্ড শরীর এবং কুৎসিত মুখের চেহারা

দেখে বুঝতে পারল রানা কেন ওরকম আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল রিতা ওকে সেই লোক মনে করে। ভয় পাওয়ার কথাই। যেমন লম্বা চওড়া, তেমনি ভয়ংকর। খালি গা, পরনে শুধু একটা হাফ প্যান্ট। ঘন কাল লোমে ছেয়ে আছে সারা শরীর—গরিলার মত। হাত দুটো হাঁটু পর্যন্ত লম্বা।

লাইন বেঁধে নেমে গেল ওরা সিঁড়ি বেয়ে। খুব সম্ভব দ্বিতীয় আহত ব্যক্তিকে আনতে যাচ্ছে। অন্ধকার ছায়া ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা রিতাকে নিয়ে।

দ্রুতপায়ে নেমে এল ওরা নীচে। চড়া গলায় তর্ক করছে দুজন ড্রয়িংরূমে। দৈত্যটা ওর সংগিকে নিয়ে গিয়ে ঢুকেছে ওখানেই। এখুনি বেরিয়ে আসবে। চারিপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই রানা বুঝল, এদিক দিয়ে গাড়ী-বারান্দায় পৌঁছতে হলে ওদের সরাতে হবে ড্রয়িংরূম থেকে। পিছন দিকে কোন দরজা পাওয়া যায় কিনা দেখা দরকার। ওদিকে অবশ্য কুকুরের ভয় আছে, তবু বিকল্প ব্যবস্থা যত বেশী রাখা যায় ততই ভাল। পাশের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে ঢুকে পড়ল দুজন।

একটা খাটের উপর আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে একজন লোক। দরজার আড়াল থেকে দেখা গেল জখম হওয়া দ্বিতীয় লোকটাকে চ্যাংদোলা করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে সেই দু'জন। ড্রয়িংরূম থেকে এঘরে ঢোকার একটা দরজা রয়েছে, খোলা। পাশের ডাইনিং হলে ঢুকতে হলে এই দরজার সামনে দিয়ে যেতে হবে। তার্কিক দুজন পাশের

ঘরে ঠিক কোন জায়গায় কোন দিকে মুখ করে বসেছে জানা নেই, দরজাটা পেরোলে ওদের চোখে পড়ে যাবে কিনা বুঝতে পারছে না রানা; তবু ঝুঁকিটা নেয়াই স্থির করল। একবারো পিছনে না চেয়ে পার হয়ে এল দরজাটা। তর্কে একটুও ছেদ পড়ল না দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ডাইনিং হলের অনেকখানি অংশ। ঘরটা একটা পুরু কালো পর্দা দিয়ে ভাগ করা হয়েছে আধাআধি। পাশেই কিচেন। কিচেন থেকে বাইরে যাবার জন্যে সার্ভেন্টস্ ডোর থাকাই স্বাভাবিক। ওদিকে পা বাড়াতে গিয়েও মচ্ মচ্ শব্দ শুনে ঝট করে পিছন ফিরল রানা।

খাটের উপর উঠে দাঁড়িয়ে লাফ দিয়েছে লোকটা রানার উদ্দেশে। হাতে আট ইঞ্চি ব্লেডের চকচকে ছুরি। চট করে একপা সরে গিয়ে উড়ন্ত অবস্থাতেই লোকটার ঘাড়ের পিছনে মারল রানা কারাতের কোপ। দড়াম করে পড়ল আঘাতটা জায়গা মত। প্রায় অস্ফুট একটা আওয়াজ বেরোল ওর গলা দিয়ে। মেঝেতে আছড়ে পড়ার আগেই ধরে ফেলল রানা ওকে। কিন্তু ছুরিটা ধরতে পারল না। খটাশ করে মেঝেয় পড়ল ওটা। লোকটাকে তুলে শুইয়ে দিল রানা খাটে, ঢেকে দিল চাদর দিয়ে। পাশের ঘরে কথাবার্তা থেমে গেছে। মৃদু কণ্ঠে ডাক দিল একজন।

'বেলাল'।'

রানা, ইংগিত করল রিতাকে, নিঃশব্দে উচ্চারণ করল 'ম্যাও'। বুঝতে পারল রিতা।

'ম্যাও'।' নরম গলায় বেড়ালের ডাক দিল রিতা।

হাসির শব্দ পাওয়া গেল, আবার শুরু হল কথাবার্তা। মাথার উপর দোতালায় পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। দ্রুত-পায়ে চলে এল ওরা কিচেনে। সত্যিই বাইরে বেরোবার দরজা রয়েছে একখানা। ভিতর থেকে হুঁড়কো তোলা।

দরজাটা খুলেই আবার ভিড়িয়ে দিল রানা। দশহাত তফাতে পাইপের গোড়ায় নাক ঠেকিয়ে গন্ধ শুঁকছে একটা প্রকাণ্ড কালো এ্যালসেশিয়ান। উপর দিকে চেয়ে খুঁজছে রানাকে। দরজাটা ফাঁক হতেই বাঘের চোখে চাইল এদিকে।

বেলানের ছুরিটা কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা বাইরে। যেন কুকুরটার অস্তিত্ব সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়, এমনি ভাবে নেমে এল ছোট সিঁড়ির তিন ধাপ। নড়ে উঠল একটা ছায়া, পরমুহূর্তে 'ঘাঁউ' করে একটা ছোট্ট গর্জন তুলেই লাফ দিল ওটা রানার কণ্ঠনালী লক্ষ্য করে। বসে পড়ল রানা, ছুরিটা চালাল উপর দিকে, হৃৎপিণ্ড বরাবর আমূল বিঁধিয়ে দিয়ে একটানে চিরে দিল তলপেট পর্যন্ত। হুড়মুড় করে পড়ল প্রভুভক্ত কুকুরটা রানার মাথার উপর দিয়ে টপকে তিন হাত তফাতে। এবং পড়েই থাকল।

রিতাকে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা বাইরে। ঠিক এমনি সময় দোতালার কাচ ভাঙা জানালাটা খোলার শব্দ

পাওয়া গেল।

ব্যাস। লুকোচুরি খতম। ঠেলা দিল রানা রিতার পিঠে।

'দৌড় দাও। আমি এদিকটা সামলাচ্ছি।'

ডাইনিং হলে ফিরে এল রানা। মাথার উপর দ্রুত পায়ের শব্দ। কালো পর্দাটা সরাল রানা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেছে সে।

সর্বাধুনিক মডেলের ছোট্ট একটা অফসেট ছাপার মেশিন। পাশেই একটা বিদ্যুৎচালিত পেপার কাটিং মেশিন। তাকের উপর দশ-বারোটা বিদেশী দামী কালির টিন। এক কোণে থরে থরে সাজান কাগজ। সেই কাগজ। সবকিছু সাজান গোছান, তকতকে, ঝকঝকে। শুধু এক-জোড়া প্লেটের অপেক্ষা। ও দুটো পেয়ে গেলেই ছাপার কাজ শুরু হবে।

সিঁড়িতে ধুপধাপ পায়ের শব্দ। পাশের ঘরে চলে এল রানা।

'কি ব্যাপার, পাঞ্জা?' উর্দুতে প্রশ্ন করল একজন।

উর্দুতেই উত্তর এল উত্তেজিত কণ্ঠে, 'পালিয়েছে। বাঁধন কেটে জানালা গলে পালিয়ে গেছে মেয়েলোকটা।'

'অসম্ভব। কি করে পালাবে ঐ মেয়েলোক একা?' সোফার স্প্রিঙের শব্দ এল। উঠে দাঁড়িয়েছে বক্তা। 'ঘাবড়াবার কিছুই নেই। চারিপাশের ফ্লাড লাইট জ্বেলে দাও। পালিয়ে যাবে কোথায়? মাগীকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে

দেবে লামা। সবাইকে জাগিয়ে দাও। যাও তুমি, হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না।'

'লামার পেট ফেড়ে মেরে রেখে দিয়ে গেছে,' বলল পাঞ্জা। 'ওপরের জানালা দিয়ে টর্চ ফেলে দেখেছি পড়ে আছে ও রান্নাঘরের সিঁড়ির কাছে। মরা।'

'বেলাল!' হাঁক ছাড়ল লোকটা। 'বেলাল কোথায় গেল? ডাক সবাইকে। সার্চ পার্টির ব্যবস্থা কর। নিশ্চয়ই বাইরের কেউ ঢুকেছে। তৈরি হয়ে যাও সবাই, জলদি!'

দূরে সরে গেল পায়ের শব্দ। এমনি সময়ে মৃদু গর্জন তুলে স্টার্ট নিল কনসাল কর্টিনা।

'ঐ যে পালাচ্ছে! চল, জামসেদ, আমরা এদিক দিয়ে বেরোই।'

ঝনঝন করে গোটা চারেক চামচ ছুঁড়ে দিল রানা ড্রয়িংরুমের ভিতরে। তারপর পিস্তল হাতে এসে দাঁড়াল চৌকাঠের উপর। দরজা খুলে রিতার দিকে পিস্তল তুলেছিল একজন, পিছন ফিরে চেয়েই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল ওর।

'খবরদার!' বলল রানা। 'ফেলে দাও পিস্তল, নইলে গুলি খাবে।'

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে রিতাকে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে এদিকে। খটাশ করে মেঝেতে পড়ল দুটো পিস্তল। বাম হাতে ইশারা করল রানা রিতাকে। সাঁ করে

বেরিয়ে গেল গাড়ীটা। দুই পা এগিয়ে এল রানা।

'পা দিয়ে এদিকে ঠেলে দাও পিস্তল দুটো। গুড। এইবার তোমার লোকেদের...'

আর কিছুই বলতে পারল না রানা। দপ করে নিভে গেল বাতি। সাথে সাথেই প্রচণ্ড জোরে কি যেন এসে আঘাত করল ওর মাথার পাশে। হাত থেকে খসে ছিটকে চলে গেল পিস্তলটা। ঘুরে উঠল মাথাটা। মনে হল চোখ দুটো ছিটকে বেরিয়ে গেল কোটর থেকে। আবার এল আঘাতটা।

মেঝেতে লুটিয়ে পড়বার আগেই জ্ঞান হারাল রানা।

দশ

একটা চোখ এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ খুলল রানা।

মেঝের উপর কাত হয়ে শুয়ে আছে সে। আধ হাত দূরে লোমশ পা দেখা যাচ্ছে একটা। পাটা উঁচু হল, ধাঁই করে এসে পড়ল ওর পাঁজরের উপর। ককিয়ে উঠে পাশ ফিরে ঘুমাবার উপক্রম করল রানা। কথা বলে উঠল একজন।

'উঠে পড়ুন জনাব। আর কত ঘুমাবেন? সকাল হয়ে এসেছে প্রায়।'

পা দিয়ে ঠেলে চিৎ করা হল রানাকে। বহু কষ্টে চোখ খুলল সে। হোয়াইট ওয়াশ করা ছাত, একটা ফ্যান ঘুরছে বনবন করে, উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। যে ঘরে জ্ঞান হারিয়েছিল, সেই ঘরেই রয়েছে সে এখনো। সোফায় বসে রয়েছে থুতনিতে সামান্য দাড়িওয়ালা লোকটা। আহমদ শফিক। ফিনফিনে পাজামা-পাঞ্জাবী, পায়ে নাগরা। পাতলা-সাতলা সৌখিন মানুষ।

ধীরে ধীরে উঠে বসল রানা। ঘুরে উঠল মাথাটা। কোট খুলে নেয়া হয়েছে ওর, ঘরের এক কোণে পড়ে আছে সেটা। সোফার সামনে নীচু টেবিলের উপর রাখা রয়েছে রানা এবং দেবাশীষের পাসপোর্ট, মানিব্যাগ, আর ওয়ালথার পি. পি.।

ঘোলাটে, অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সোফায় বসা লোকটা রানার চোখের দিকে মিনিট খানেক। তারপর মৃদু হাসি ফুটল ওর পাতলা লালচে ঠোঁটে।

'ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করে বলুন জনাব। কেন কি ঘটছে বুঝতে পারছি না আমি গতকাল থেকে।' রানার উত্তরের জন্যে আধ মিনিট অপেক্ষা করে বলল, 'আমার সওয়ালের জওয়াব না দিয়ে উপায় নেই আপনার। দেরি করলে শুধু শুধু জুলুম হবে আপনার ওপর, তকলিফ হবে আমাদের—আর কোন লাভ হবে না।'

'আপনাদের তকলিফ দিতে খুবই কষ্ট হবে আমার,' বলল রানা, 'জান বেরিয়ে যাবে যন্ত্রণায়, কিন্তু আমার মনে হয় না কোন রকম ব্যাখ্যা দিয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব। যত ব্যাখ্যাই দিই না কেন, তকলিফ আপনারা করবেনই।'

হাসল লোকটা। 'আপনার রস বোধ প্রশংসনীয়। আপনার অবস্থায় পড়লে কথা নিয়ে চাতুরী করবার কথা কল্পনাতেও আসত না আমার। অবশ্য আপনার সত্যিকার অবস্থা সম্পর্কে আপনি সচেতন কিনা সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আপনি নিশ্চয়ই ঠিক মত জানেন না, কাদের আড্ডায় ঢুকে পড়েছেন, কাদের হাতে ধরা পড়েছেন। আপনাকে জানিয়ে দেয়া আমার কর্তব্য, যে ঠিক হাসি-মস্করার সময় এটা নয়। আমরা তকলিফ করব, না আপনার বিনা যন্ত্রণার মৃত্যু হবে, সেটা নির্ভর করবে আপনার সহযোগিতার ওপর। উভয় ক্ষেত্রেই পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু।'

'শুধু দুটো ক্ষেত্রে কেন, সব ক্ষেত্রেই তাই,' দার্শনিকের ভংগিতে বলল রানা। 'সবারই পরিণতি ঐ এক। জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে।'

'বেহুদা বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে আপনার কৈফিয়ৎ দিন।'

'আগে আপনি কৈফিয়ৎ দিন দুল্হা মিঞা।'

এক পা এগিয়ে এসে প্রকাণ্ড এক লাথি তুলল পাণ্ডা,

কিন্তু সোফায় বসায় লোকটা বলল, 'না না, পাঞ্জা। এখন না।' সাথে সাথেই থেমে গেল দৈত্যটা। মার্জিত কণ্ঠে এবার রানাকে বলল, 'বোকামী করবেন না জনাব মাসুদ রানা। বেয়াদবী সহ্য করব না আমি। সমস্ত তুরুপের তাশ আমার হাতে। নিন শুরু করুন।'

হাফ প্যান্টের পকেটে দুই হাত ভরে ঘাড় কাত করে বাঁকা চোখে চেয়ে রয়েছে পাঞ্জা রানার দিকে। শরীরের সমস্ত পেশী সজাগ প্রস্তুত হয়ে রয়েছে ওর যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপ দেয়ার জন্যে। ওর প্রকাণ্ড শরীরের উপর চোখ বুলাল রানা। বোঝা যাচ্ছে, পাকিস্তানী মাল, কিন্তু ঠিক কোন এলাকার জিনিস বুঝে উঠতে পারছে না। ঘাড় ফিরাল সে সোফায় আসীন প্রতিক্ষারত যুবকটির দিকে। বাঙালী তাতে সন্দেহ নেই। রানারই বয়সী হবে। বোঝা যাচ্ছে, শিক্ষিত এবং মার্জিত। অথচ কি আশ্চর্য অমিল ওদের দুজনের মধ্যে। এই লোকের অদ্ভুত সাংগঠনিক ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। দুঃসাহস সম্বন্ধেও সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে বসে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগঠন এবং তৎপরতা চালান বেপরোয়া দুঃসাহসী লোক ছাড়া সম্ভব নয়। রানার সাথে ওর তফাত শুধু মতাদর্শের। দুজনই ওরা ঘোরের মধ্যে আছে, দুজনেরই পরিপূর্ণ আস্থা রয়েছে নিজ নিজ বিশ্বাসের প্রতি, সক্রিয় ভাবে কাজ করছে দুজনই—তাই আজ মুখোমুখি হয়েছে ওরা। খুব সম্ভব মৃত্যু হবে যে কোন একজনের। মত ও

পথ এমনি অনমনীয় ব্যাপার যে মানবিক সহানুভূতি অবান্তর হয়ে পড়ে। যাই হোক, মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে মুখ খুলল রানা।

'কোন তাশই নেই আপনার হাতে। মনে মনে তাশের ঘর তৈরি করেছেন। ভেঙে যাবে সে ঘর। সে যাই হোক, আমার পরিচয় জেনে নিয়েছেন পাসপোর্ট থেকেই। আর কি জানতে চান আপনি?'

'জানতে চাই কাদের হয়ে কাজ করছেন আপনি? আসলে আপনি কে?'

'আমি একজন বে-সরকারী গোয়েন্দা। কাজ করছি নিজের জন্যে। গত ছয়মাসের যে কোন দৈনিক কাগজে অন্ততঃ তিরিশবার আমার সম্পর্কে লেখা বেরিয়েছে। চেষ্টা করে দেখলে হয়তো স্মরণ করতে পারবেন।'

'মনে পড়েছে। তাই ভাবছিলাম নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে কেন। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুবই খুশি হলাম। কাজের কথায় আসা যাক—দেবাশীষ দত্তের সাথে আপনার পরিচয় আছে?'

'ছিল। বছর দুয়েক আগের পরিচয়।'

'উনি কোথায়?'

'সে খবর জানেন না আপনারা?'

'জানতে চাইছি।'

'তাহলে যে কাজে নেমেছেন সেটা ছেড়ে দিয়ে মাদ্রাসায় ফিরে যান। গর্দভ দিয়ে এসব কাজ চলে না।' আবার

লাথি তুলেছিল পাণ্ডা, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে যেন মাছি তাড়াচ্ছে, এমনি ভাবে হাত নেড়ে থামিয়ে দিল ওকে রানা। 'জ্বালিয়ে মারল লোকটা। থাম ত মিস্টার ফ্র্যাংকেনস্টাইন। জ্ঞান হারালে কথা বলতে পারব না।'

রানার কথায় নয়, ডান হাতের একটা আঙ্গুল তুলেছিল সোফায় বসা লোকটা, তাই দেখে থেমে গেল পাণ্ডা। রানার দিকে ফিরল লোকটা। 'কোথায় দেবাশীষ দত্ত?'

আঙ্গুল তুলে উপর দিকে দেখাল রানা।

'মেরে ফেলেছেন?'

রানা বুঝল ওর ধারণাই ঠিক। দেবাশীষের হত্যাকারী এরা নয়, অন্য কেউ। এক সেকেণ্ডে চিন্তা করে নিল অবস্থাটা।

'বাঁচা মরা খোদার হাত। আমরা নিমিত্ত মাত্র।'

মাথা ঝাঁকাল আহমদ শফিক। ঘোলাটে চোখে চাইল রানার চোখে। বলল, 'তাহলে আপনার এবং আপনার বন্ধু রাজেশ মল্লিকের সাথেই বোঝাপড়া করতে হবে আমাদের।'

'রাজেশ মল্লিক আমার বন্ধু নয়।'

'তাহলে শুধু আপনার সাথে। সেটাই আমাদের পক্ষে সুবিধেজনক হবে।' হাসল আবার সে লালচে ঠোঁটে উল্টে প্রাণহীন হাসি। 'বলুন দেখি, জনাব মাসুদ রানা, এসবের মধ্যে জড়িয়ে আপনি কি ফায়দা ওঠাবার কথা ভাবছেন? কেন জড়িয়েছেন?'

হো হো করে হেসে উঠল রানা। ছটফট করে উঠল পাঞ্জা।

'হুজুর, আর সহ্য করতে পারছি না আমি। এক মিনিটের জন্যে একটু অনুমতি দেন।'

'চোপরাও সাংকো পাঞ্জা!' ধমক দিল রানা। 'বড়রা কথা বলছে, গোলমাল কর না।' আহমদ শফিকের দিকে ফিরল সে। 'মাই ডিয়ার স্যার ডন কুইক্‌যট্‌, গোয়েন্দা হিসেবে আমার যা উপার্জন তাতে পোষাচ্ছে না আমার। বড় কিছুর ধান্ধায় ফিরছি আমি সর্বক্ষণ এই সুযোগটা এসে গেল, গ্রহণ করলাম। বড় কিছুর আশায়।'

'দেবাশীষের পরিচয়ে বর্ডার পেরোলেন কেন?'

'আপনাদের চোখে পড়ার জন্যে। দত্ত ত মরেই খালাস, আমি বেচারা এখন পথ পাই কোথায়? টু পাইস করতে হলে পার্টির সাথে যোগাযোগ ত করতে হবে? বর্ডারে এমন এক গাধাকে পাঠিয়েছিলেন যে চিনতেই পারল না আমাকে। কাজেই কাগজ ছিঁড়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমার'

'আপনার সাথের লোকটা কে ছিল?'

'আমার এ্যাসিস্ট্যান্ট। একগুচ্ছ অযোগ্য লোক নিয়ে আপনার কারবার। ও না হয়ে যদি আমি মারা যেতাম তাহলে আপনারা যা খুঁজছেন সেটা পাওয়ার আর কোন রাস্তাই থাকত না আপনাদের। আমার পরামর্শ হচ্ছে, সব ঝেঁটিয়ে বিদাই করে দেন, যোগ্য লোক জোগাড় করে

দেব আমি।'

'এখানে এলেন কি করে?'

'আপনার স্যাঙাৎদের পিছু পিছু।'

'কেন এসেছেন? দেবাশীষের বোনকে উদ্ধার করতে?'

'আরে না। আপনাদের উদ্ধার করতে।'

'ওকে আমাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে আপনার কি লাভ?'

'থোড়াসা ইশ্‌ক্ এসে গেল জানানার ফিগার দেখে। আপনার এই দৈত্যের হাতে পড়লে ওর আর কিছু অবশিষ্ট থাকত না। আশা আছে ভবিষ্যতে খোদা চাহে ত খানিকটা লাভ (love) হতেও পারে।'

'ও যে সোজা গিয়ে পুলিশে খবর দেবে না এই নিশ্চয়তা কোথায় পেলেন?'

'ওর জানা আছে ওর দাদা বেআইনী কাজে লিপ্ত ছিল। আর যাই হোক, পুলিশের কাছে যাবে না ও। গোপন এক আস্তানায় অপেক্ষা করবে আমার জন্যে।'

'কোথাও কারো জন্যে অপেক্ষা করবে না, সোজা ফিরে আসবে ও এখানে।' হাসল আহমদ শফিক লালচে হাসি। 'জামসেদ, বেলাল আর সগির গেছে ওকে ধরে আনার জন্যে। মোটর সাইকেলে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে ওকে নিয়ে। পাঞ্জার হাতে তুলে দেয়া হবে ওকে।'

'সে দেখা যাবে পরে। সময় নষ্ট করছি আমরা।

কাজের কথা শেষ করে ফেলা যাক। আমি আপনাদের হাতের মুঠোয় রয়েছি, কিন্তু আপনারা যা চান সেটা রয়েছে আমার হাতের মুঠোয়। কথাবার্তা যা হবার খোলাখুলিই হয়ে যাক। কি বলেন?'

রানার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে পাঞ্জা। বুঝতে পারল রানা, সময় আর বেশী হাতে নেই। কথাবার্তার ফাঁকে সামলে নিয়েছে সে অনেকটা। আর খানিকক্ষণ দেরি করাতে পারলে পাঞ্জার হাত থেকে আত্মরক্ষা করা একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে।

পায়ের উপর পা তুলে আর একটু আয়েশ করে বসল আহমদ শফিক।

'বিনিময়ে কি চান আপনি?' ঘোলাটে চোখে কটমট করে চাইল আহমদ শফিক রানার দিকে। 'আপনার দাবীটা কি?'

'তার আগে আমাকে বলুন আপনি কি ব্যক্তিগত লাভের জন্যে এই কাজে নেমেছেন, নাকি সমষ্টিগত ভাবে কোন আদর্শের পেছনে কাজ করছেন? দুটো ব্যাপার আলাদা। আমার রেটও আলাদা হবে।'

'আমরা 'মুসলিম বাংলা' আন্দোলনের একটা ছোট-খাট কিন্তু শক্তিশালী ইউনিট। আমাদের আক্রমণ গোলাবারুদ নিয়ে মানুষের ওপর নয়, গোটা দেশের অর্থনীতির ওপর। চালের দর হাজার টাকায় তুলে দেব আমরা আগামী ছয় মাসের ভেতর। কাজেই বুঝতে

পারছেন, এটা আমার ব্যক্তিগত কোন ব্যবসা নয়। সেক্ষেত্রে আপনার দাবী কত?'

'কিন্তু এর মধ্যে মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ী বনোয়ারীলাল ঝুনঝুনওয়ালা কেন?' প্রশ্ন করল রানা।

'অনেক খবরই রাখেন দেখছি। শুনুন তাহলে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রচুর টাকা আসছে। কিন্তু শিপমেণ্ট অনিয়মিত। সেজন্যে আমরা এখানেই ব্যবস্থা করে নিয়েছি। ও আধা-শেয়ারে এসেছে ওর নিজস্ব কারণে। ওদের কয়েকজনের একটা ব্যবসায়িক জোট আছে, ওরা এদেশের অর্থনীতিটা নিজেদের হাতের মুঠোয় আনতে চায়। এই টাকা গছিয়ে দিয়ে চাল, চা আর পাট, এবং সেই সাথে কিছু রিলিফের মাল কিনে ওপারে পাচার করতে চায়। যত খুশী দাম হাঁকতে পারছে ওরা বিনা দ্বিধায়, গাঁটের থেকে একটা পয়সাও যাচ্ছে না। আপাততঃ এই ব্যবস্থায় আমাদের কোন আপত্তি নেই। প্রয়োজনে শত্রুর সাথেও হাত মেলাতে প্রস্তুত আমরা। কাজ উদ্ধার হয়ে গেলেই লাথি মেরে দুর করে দেব ওদের। বলুন জনাব মাসুদ রানা,' গলার স্বর পরিবর্তন করল আহমদ শফিক, 'আপনার দাবীটা বলে ফেলুন।'

'একটা সিগারেট খেতে পারি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। পাঞ্জা, প্যাকেট আর লাইটারটা দাও ওর হাতে।'

যথেষ্ট সময় নিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। তারপর

বলল, 'আপনিই একটা এ্যামাউন্ট বলুন মিস্টার কুইকযোট। আমি চাইলে হয়তো কম চেয়ে বসব, কে জানে, আমি যা চাইব তার চাইতে হয়তো অনেক বেশীই দিতে প্রস্তুত আছেন আপনি। নিজে থেকে চেয়ে বসে শেষকালে ঠকব নাকি আবার?'

'ঠিক আছে, আমার অফার আমি বলছি, দেখুন চিন্তা করে আপনার পোষায় কিনা।' হাসল আহমদ শফিক 'প্লেট দুটোর বিনিময়ে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেব আমি। বলুন, রাজি?'

'এ তো চমৎকার অফার,' বলল রানা। 'অপূর্ব। এতে রাজি না হওয়ার কি আছে? এর চাইতে ভাল অফার আর কিছু হতেই পারে না। এক কথায় রাজি। তবে আমার পাওনাটা আগে মিটিয়ে দিতে হবে, তারপর আমি বলব কোথায় আছে প্লেট দুটো।'

'অর্থাৎ মৃত্যু বরণ করবেন, কিন্তু ওগুলো আমাদের হাতে তুলে দেবেন না—এই ত?' গম্ভীর আহমদ শফিক। ধকধক করে জ্বলছে ঘোলাটে চোখ দুটো। একটা শব্দ উচ্চারণ করল, 'পাঞ্জা।'

লাফ দিয়ে সরে গেল রানা বাম পাশে, এক গড়ান দিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

দেড় ফুট লম্বা ভারি একটা মুগুর চালিয়েছিল পাঞ্জা প্রাণপণ শক্তিতে। রানা সরে যেতেই কোথাও বাধা না পেয়ে বোঁ করে শূন্যে ঘুরে ভারসাম্য টলিয়ে দিল পাঞ্জার।

রানার বিদ্যুৎগতি চমকে দিয়েছে ওকে। কিন্তু বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে এক সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগল না ওর। ততক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রানা। ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টা না করে শরীরটা এলিয়ে দিল পাঞ্জা যেদিকে পড়ে যাচ্ছিল সেদিকেই—ফলে রানার ঘুষিটা তেমন জোরে লাগল না ওর। হুড়মুড় করে পড়ল দুজন শক্ত মেঝের উপর। এক ঝটকায় সরিয়ে দিল পাঞ্জা রানাকে বুকের উপর থেকে। শুয়ে শুয়েই পা চালাল রানা। স্টীলের পাত বসান জুতোর সোল খটাং করে গিয়ে পড়ল পাঞ্জার হাঁটুর নীচে শক্ত হাড়ের উপর। যন্ত্রণাকাতর গর্জন করে উঠল দৈত্যটা। উঠে দাঁড়াল এক পায়ে ভর দিয়ে। শুয়ে শুয়েই আরেকটা লাথি মেরে পাটা মাটি থেকে শূন্যে তুলে দিল রানা। দড়াম করে আছড়ে পড়ল দৈত্য। পড়েই মুগুরটা চালাল আবার দাঁত মুখ খিঁচে।

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল রানা, বাম কাঁধের উপর পড়ল আঘাতটা। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে নিজের অজান্তেই। আঁধার হয়ে এল চোখ। যখন উঠে দাঁড়াল, বাম হাতটা ঝুলছে কাঁধ থেকে আলগা ভাবে, উপরে তোলার ক্ষমতা নেই। ঐ অবস্থাতেই প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল রানা পাঞ্জার তলপেট লক্ষ্য করে ঝট করে সরে গিয়ে জুতোশুদ্ধ পা ধরে ফেলল পাঞ্জা, মোচড় দিল। পড়ে যচ্ছে রানা, কিন্তু এমন ভাবে পড়ল যেন বাম হাঁটুটা গিয়ে আঘাত করে পাঞ্জার তলপেটে।

তীব্র ব্যথায় কাতরে উঠল পাঞ্জা। পা ছেড়ে দিয়ে রানার অকেজো বাম হাতটা ধরে মোচড় দেয়ার চেষ্টা করছে। ডান হাতে পরপর দুটো ঘুষি মারল রানা ওর নাক-চোখ বরাবর। নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এল, বাম চোখটা বুঁজে এসেছে সংগে সংগেই। রানার হাত ছেড়ে দিয়ে মাথাটা এপাশ ওপাশ ফিরিয়ে ছটফট করছে ও এখন। উঠে দাঁড়িয়ে আরেকটা লাথি মারল রানার পাঞ্জার পাঁজরে, হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি। কুঁকড়ে গিয়েই স্থির হয়ে গেল পাঞ্জা। জ্ঞান হারিয়েছে।

'ব্যাস হয়েছে। এবার সোজা হয়ে দাঁড়ান!' বলল আহমদ শফিক।

ঝট করে ঘুরল রানা। আহমদ শফিকের হাতে শোভা পাচ্ছে একটা ছোট্ট পিস্তল। রানার বুকের দিকে সেটা তাক করে ধরা। এগোতে গিয়েও থেমে গেল রানা।

'এক পা সামনে বাড়লে গুলি খাবেন জনাব!' শান্ত কণ্ঠে বলল আহমদ শফিক। 'আমার গুলি মিস হয় না। মারব না, জখম করব শুধু। প্লেট দুটো আদায় করার আগে আপনার প্রাণের মূল্য কয়েকশো কোটি টাকা। কিন্তু জখম হওয়াটা কি ভাল?'

যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল রানা। বাইরে একটা গাড়ীর ইঞ্জিনের শব্দ পাওয়া গেল। দমে গেল রানার মনটা। লালচে হাসি ফুটল আহমদ শফিকের ঠোঁটে।

'আপনি যদি মনে ক'রে থাকেন যে ওটা পুলিশের গাড়ীর আওয়াজ তাহলে বড় নিরাশ হতে হবে আপনাকে। ওদিকটা ম্যানেজ করে ফেলা হয়েছে ইতিমধ্যেই। ফিরে আসছে আমার লোক রতা দত্তকে নিয়ে। ফালতু কথায় এতক্ষণ সময় নষ্ট করলাম এই জন্যেই। অপেক্ষা করছিলাম ওদের জন্যে।'

গেটের কাছে পৌঁছে গেছে গাড়ীটা। দ্রুত চিন্তা করছে রানা। একা হলে তাও কথা ছিল, শেষ চেষ্টা করে দেখত রানা, কিন্তু রিতাকে ধরে আনার পর বাঁচবার আর কোন রাস্তাই দেখা যাচ্ছে না। এক্ষুণি কিছু একটা করে বসবে সে? কি করবে? সামান্য নড়াচড়া করলেই গুলি খেতে হবে। তবু ঝাঁপিয়ে পড়বে সে?

'লাভ নেই জনাব!' যেন রানার চিন্তারই উত্তর দিচ্ছে এমনি ভাবে বলল আহমদ শফিক। 'প্রথম গুলিটা করব আপনার ডান কাঁধে, তারপর দুটো গুলিতে ভর্তা করে দেব দুই হাঁটু। সুযোগ পেলে আপনি কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারেন সে ত চোখের সামনেই দেখলাম। কাজেই সুযোগ দেব না। তাছাড়া আপনার আসল পরিচয় আমার জানা আছে। গত বছর জানুয়ারীর শেষের দিকে মাওলানা ইকরামুল্লাহ্‌র গুলশানের আস্তানা আক্রমণ করেছিলেন আপনি, ছত্রভংগ করে দিয়েছিলেন তাঁর দল*, মস্ত ক্ষতি করেছিলেন আমাদের, সেসব পরিষ্কার

*এখনো ষড়যন্ত্র,—রানা ২৫ দ্রষ্টব্য।

ছবির মত জ্বলজ্বল করছে আমার স্মৃতিতে। আমি ছিলাম সেইখানে। আপনি কতখানি বেসরকারী গোয়েন্দা, তা জানা আছে আমার। ইঞ্জেকশন ছাড়া আপনার কাছ থেকে যে একটি কথাও বের করা যাবে না সেটা ভাল করেই জানি বলে কোন রকম চাপাচাপি করিনি আমি প্লেটগুলো কোথায় রেখেছেন জানার জন্যে। ওষুধ পড়লে আপনিই বেরিয়ে যাবে সব কথা। তারপর···'

থেমে গেল আহমদ শফিক। আধ মিনিট আগেই গাড়ী বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ীটা. ইঞ্জিন চালু আছে এখনো, কিন্তু কারো সাড়াশব্দ নেই। ভ্রু কুঁচকে গেল ওর। ঝট করে ফিরল পিছন দিকে।

'বুম্‌ম্‌ম্‌!'

রানার কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল একটা গুলি, সোজা গিয়ে বিঁধল আহমদ শফিকের হাতে। ছিটকে পাঁচহাত দূরে গিয়ে পড়ল ছোট্ট পিস্তলটা। আর্তনাদ করে উঠে এইদিকে ফিরল আহমদ শফিক। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখটা, আতংক দেখা দিল দুই চোখে।

ধীরে ধীরে পিছু ফিরল রানা। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে গোপাল ভৌমিক। ওর হাতে ধরা আছে প্রকাণ্ড মাউযারটা, পিস্তলের মুখে সামান্য ধোঁয়া। একগাল হাসল ভৌমিক।

'কিছু মনে করবেন না, ডিসটার্ব করলাম। এই পিস্তলটার শব্দটা বড় বেশি আওয়াজ।' চারিপাশে চেয়ে

অবস্থাটা বুঝে নিল গোপাল ভৌমিক এক সেকেণ্ডে। 'চলুন, 'এবার কেটে পড়া যাক।' এগিয়ে এল সে ঘরের মাঝখানে, পাঞ্জার তলপেটে একটা মাঝারী লাথি মেরে দেখল জ্ঞান ফিরেছে কিনা।

আহমদ শফিকের মুখ থেকে যন্ত্রণার রেখা মুছে গেছে, আতংক দূর হয়ে গেছে ঘোলাটে দুই চোখ থেকে—তীব্র আক্রোশ আর ঘৃণা স্থান পেয়েছে এখন ওর দৃষ্টিতে। কটমট করে চেয়ে রয়েছে সে ভৌমিকের চোখের দিকে।

সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই গোপাল ভৌমিকের। রানার হাতের দিকে চেয়ে বলল, 'ও কিছু নয়, অবশ হয়ে গেছে একটা নার্ভ, ঠিক হয়ে যাবে খানিক বিশ্রাম পেলেই। নিশ্চয়ই দানবটার কাজ? ওর নিজেরও অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়।' কোটটা গায়ে দিতে সাহায্য করল সে রানাকে, কাগজ-পত্র টপাটপ ভরে দিল কোটের পকেটে। রানা পিস্তলটা নিয়ে শোলডার হোলস্টারে পুরতেই ধরল রানার ডান হাত, 'চলুন, ভাগি।'

'মোটর সাইকেলে করে কাউকে খুলনার দিকে যেতে দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সব দেখেছি, মশায়, সব দেখেছি। দেবাশীষের বোনকে দেখলাম তুফান বেগে ছুটছে খুলনার দিকে, মাইল খানেক পিছনে দেখলাম ওটাকে তাড়া করছে একটা মোটর সাইকেল। একে অতিরিক্ত স্পীডে যাচ্ছিল, তার ওপর দেখি ট্রিপল্-রাইড করছে ব্যাটারা। আমার পছন্দ হল

না। গাড়ী দিয়ে এক ঢুঁশ মেরে ফেলে দিয়েছি রাস্তার পাশের ডিচে। তারপর সোজা চলে এসেছি।' কথা বলতে বলতে আহমদ শফিকের তীব্র দৃষ্টির দিকে নজর পড়ল ভৌমিকের। পিস্তলটা তাক করল ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর।

এক থাবা দিয়ে সরিয়ে দিল রানা পিস্তলের মুখ। গুলিটা আহমদ শফিকের কানের পাশ দিয়ে চলে গেল জানালার কাচ ভেদ করে বাইরে। চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপল্ল না লোকটার—স্থির, নিষ্কম্প, রোষ কষায়িত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে ভৌমিকের চোখে চোখে।

'বিচারের ভার আমার আপনার ওপর নেই,' বলল রানা ভৌমিকের উদ্দেশ্যে।

ছুটল ওরা গাড়ী বারান্দার দিকে।

এগার

'লামার হাত থেকে বাঁচতে হলে চট্ করে উঠে পড়ুন গাড়ীতে। ল্লা বাঘের চেয়েও ভয়ংকর।'

'পেট ফেড়ে দিয়েছি। পড়ে আছে বাড়ীর পিছনে।' দরজা লাগিয়ে দিল রানা। সোজা গেটের দিকে ছুটল গাড়ী। রানা বলল, 'আপনার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ।'

'ডোণ্ট মেন্শন্ মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, ইট ওয়ায প্লেযার। ও কিছুই নয়। ড্যাশ বোর্ডে একটা ছোট্ট বোতল আছে, ইচ্ছে করলে ব্যবহার করতে পারেন।'

সিগারেট ধরিয়ে খানিকক্ষণ বাম কাঁধটা ডান বাতে টিপল রানা, তারপর ড্যাশ বোর্ড খুলে আউন্স চারেক ধসিয়ে দিল ভৌমিকের জনি ওয়াকার। বোতলের মুখটা বন্ধ করে রেখে দিল যথাস্থানে। আকাশটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি থেমে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

'কি, কিছুটা আরাম বোধ করছেন না?' বলল ভৌমিক। 'আপনার জন্যেই এনেছি ওটা।'

'এত দেরী করলেন কেন পৌছতে?'

হাসল ভৌমিক। 'ভাগ্যিশ আরো খানিকটা দেরী

করিনি! দৈত্যটার জ্ঞান ফিরে এলে রাম প্যাঁদানি দিয়ে হাগিয়ে ফেলত আপনাকে।' পিচ্ছিল ঢালু জায়গাটা সাবধানে পেরিয়ে প্রশ্ন করল, 'কি দেখলেন ওখানে?'

'যা আশা করেছিলাম তার বেশি কিছুই নয়। ছোট্ট একটা অফসেট প্রিন্টিং মেশিন।'

'তার মানে আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে?'

'না। তা হয়নি। অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে ঠিকই. কিন্তু সবটা জানা হয়নি।'

'আমাকে প্রশ্ন করে দেখুন, আমার হয়তো জানা থাকতে পারে।'

'প্রথম প্রশ্ন, আমাকে অনুসরণ করেছিলেন কেন?'

অবাক চোখে চাইল গোপাল ভৌমিক। 'বলে কি লোকটা! অনুসরণ না করলে আপনার··'

'দেবাশীষের বাড়ী পর্যন্ত ফলো করেছেন আপনি আমাকে, ওখান থেকে সেলিম হোটেল পর্যন্ত গেছেন পিছু পিছু, যে মোড়ের ওপর গোলাগুলি হল সেখানে গাড়ী থেকে নামতে দেখেছি আমি আপনাকে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ভৌমিক। 'ঠিক। চোখের ভুল নয়। একটা ভকসল ভিভার বনেটের ওপর আপনার সার্কাসও দেখেছি আমি। আপনার বন্ধুর মৃত-দেহ দেখে সাবধানে পিছু নিয়েছি। পথে একটা চাকা বার্স্ট করায় দেরি হয়ে গেছে।'

'এই আস্তানা চিনে বের করলেন কি করে?'

'আরে, আপনি দেখছি কোন খবরই রাখেন না। ওটাই ত রাজেশ মল্লিকের বাগান বাড়ী।'

'খুলনায় আমার পিছু পিছু ঘুরছিলেন কেন?'

'আশা ছিল আপনি আমাকে রাজেশ মল্লিকের লেজটা ধরিয়ে দেবেন। আপনার কাছাকাছিই পাওয়া যাবে ওকে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম।'

হো হো করে হাসল রানা। 'সবারই ধারণা আমার কাছে গুপ্তধন আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানেন? আমার কাছে থাকা ত দূরের কথা, কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমি ভাল মত জানতামই না গুপ্তধনটা কি জিনিস' ভৌমিককে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইতে দেখে বলল 'এই দেখুন, আপনিও অবাক হচ্ছেন কথাটা শুনে। আপনারও ধারণা ওটা আমার কাছেই আছে। আহমদ শফিকের দোষ আর দিই কি করে?'

'বেশ গোলমেলে ঠেকছে ব্যাপারটা!' বলল ভৌমিক।

'হ্যাঁ। আমি মাঝপথে হঠাৎ জড়িয়ে পড়েছি বলে আমার কাছে আরো বেশি গোলমেলে মনে হচ্ছে সবকিছু।' হাসল রানা। 'আপনার পারস্পরিক সহযোগিতার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল আমার অনেক আগেই।'

'ঠিকই বুঝেছেন, মশাই, ঠিকই বুঝেছেন। কিন্তু একটু দেরিতে।' বড় রাস্তায় উঠে বাঁয়ে মোড় নিল ভৌমিক। 'আমরা দুজন একসাথে কাজ করলে খুব সহজেই চিৎ করে দিতে পারব ওদের।'

'আপনি জানতেন যে দেবাশীষ দত্ত আমাদের হয়ে কাজ করছিল ?'

'না। জানতাম না।' খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল ভৌমিক, তারপর বলল, 'অবশ্য এ ধরনের অনিয়মিত অবৈতনিক সার্ভিস আমরাও পেয়ে থাকি।'

'দেবাশীষ আমাদের হেড অফিসে জানিয়েছিল যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে সে, যেন বি. সি. আইয়ের কোন এজেন্ট তার সাথে কলকাতার একটা নির্দিষ্ট ঠিকানায় দেখা করে। বিপদের আভাসও দিয়েছিল কিছুটা। সেজন্যেই পাঠান হয়েছিল আমাকে। আমি গিয়ে মরা পেলাম ওকে। ওর পকেটে ভাটপাড়ার একটা ছাপাখানার ঠিকানা পেলাম, আর পেলাম দুটো জাল নোট। রিপোর্ট পাইনি। কাজেই আমি ছুটছি—রিপোর্টটা না নিয়ে ফিরব না ঢাকায়।' সরাসরি চাইল রানা ভৌমিকের মুখের দিকে। 'এই হচ্ছে আমার কাহিনী। এবার আপনার কাহিনী শোনান। বিকেলে ভাটপাড়ায় দেখেছি আমি আপনাকে। কি করছিলেন আপনি সেখানে ?'

'বলছি।' নাক চুলকাল ভৌমিক। 'বেশ কিছুদিন ধরেই নজর রেখেছি আমি এদের ওপর। দেবাশীষকে অনুসরণ করে কলকাতায়ও গেছি একবার দুবার ঠিক কি করে সে ওখানে জানার জন্যে। প্রস্তুতিপর্ব যখন শেষ হয়ে এসেছে, বুঝলাম এবার চালানের সাথে আসবে আসল জিনিস। কিন্তু আরেকটা ডেভেলপমেন্ট লক্ষ্য করছিলাম

মাস খানেক যাবত—চোরে চোরে মাসতুত ভাইয়ের মত দেবাশীষ আর রাজেশ মল্লিকের মধ্যে একটা যেন গোপন আঁতাত আর মাখামাখি দেখা যাচ্ছিল। কাজেই গত পরশুদিন যখন ওরা দুজন আলাদা আলাদা ভাবে বর্ডার ক্রস করল, তখন খুব একটা আশ্চর্য হইনি। আমি পিছনেই ছিলাম। দেবাশীষকে অনুসরণ করছিল রাজেশ, আমি অনুসরণ করছিলাম রাজেশকে। অত্যন্ত ধুরন্ধর লোক রাজেশ মল্লিক, তাই খুবই সাবধানে ফলো করতে হচ্ছিল আমাকে। স্না সাংঘাতিক চালু…'

'তারপর কি হল?' বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল রানা।

'হঠাৎ লক্ষ্য করলাম রাজেশ আসলে দেবাশীষকে অনুসরণ করছে না, দেবাশীষের পিছনে আহমদ শফিকের লোক সেঁটে আছে আঠার মত, রাজেশ অনুসরণ করছে তাকেই। দূর থেকে দেখলাম, প্রথমে দেবাশীষ ঢুকল নিযামুদ্দিনের দোকানে, প্রায় সাথে সাথেই ঢুকল পেছনের লোকটা, মিনিট দুয়েক রাস্তায় অপেক্ষা করে ঢুকল রাজেশ মল্লিক—আমি বেচারা আর ঢুকতে পারলাম না।'

'কেন?'

'রাজেশ ঢোকার পনের সেকেণ্ডের মধ্যে দুটো গুলির আওয়াজ পেলাম—যদিও সাইলেন্সার থাকায় আওয়াজ খুবই কম, কিন্তু চিনতে ভুল হল না আমার। পরমুহূর্তে দেখলাম ছুটে বেরিয়ে এল দেবাশীষ দত্ত, একটা হাত কোটের পকেটে। তারপর বেরোল রাজেশ মল্লিক,

তাড়াহুড়োয় আমাকে দেখতে না পেয়ে সে ব্যাটা ত হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমারই ওপর। কোনমতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার মত দু'একটা শব্দ উচ্চারণ করেই আমি উল্টো দিকে ভাগল্বা। যখন কিছুটা সামলে নিলাম তখন চিড়িয়া উড় গিয়া। দুটোই।'

'মরা লোকটা কে?'

'ওর নাম সামাদ। আহ্মদ শফিকের লোক। দেবাশীষের ওপর চোখ রাখবার জন্যে ওকে পাঠান হয়েছিল ভাটপাড়ায়।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ঠিক। সে জন্যেই বেনাপোলে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সামাদ কোথায়।'

মরিস মাইনরটা দেখা গেল ফিরে আসছে। হঠাৎ রিতার উপস্থিতি ঘাবড়ে দিয়েছে ওদের। অন্যদিকে চেয়ে বসে রইল রানা। সাঁ করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল গাড়ীটা। মুখ খুলল গোপাল ভৌমিক।

'সারাটা ভাটপাড়া তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আর ওদের টিকির পাত্তা পেলাম না। পরদিন দেখলাম দেবাশীষের বোনকে নিয়ে আপনারা দুই বন্ধু ভাটপাড়ায় গিয়ে হাজির। ব্যাস, ফলো করলাম। তারপরের ঘটনা ত আপনি জানেনই।'

'রাজেশ মল্লিক লোকটাকে খুবই কামেল লোক মনে হচ্ছে। কলকাতার বিল্টমোর হোটেলে আমি পৌঁছবার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল সে। খুব সম্ভব দেবাশীষ বিশ্বাস

ভঙ্গ করেছিল ওর সাথে। খুন করে রেখে গেছে সে ওকে হোটেল কামরায়।'

'তাহলে প্লেটগুলো পেয়ে গেছে সে। আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই।' হতাশ কণ্ঠে বলল ভৌমিক।

'না। প্লেট পায়নি রাজেশ মল্লিক। পেলে আবার সার্চ করত না দেবাশীষ, রিতা এবং আমার জিনিসপত্র। চৌরংগীর ব্রিষ্টল হোটেলে উঠেছিলাম আমরা, আমি নীচে গিয়েছিলাম কয়েক মিনিটের জন্যে, তারই মধ্যে সার্চ করা হয়েছিল আমাদের মালপত্র। রাজেশ ছাড়া আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে আমার সাথে দেবাশীষের কোন সম্পর্ক আছে। আহমদ শফিকের লোক খবরই রাখে না ভাটপাড়া বা কলকাতায় কি ঘটেছে।'

'আপনি বলছেন রাজেশ প্লেট দুটো হাতাতে পারেনি। তাহলে গেল কোথায় ওগুলো?'

'ওগুলো চুলোয় যাক, আমি ভাবছি আমার রিপোর্টটা গেল কোথায়?'

'প্লেটের ব্যাপারে আপনার কিছুই এসে যায় না মনে হচ্ছে?'

'ওসব পুলিশের ব্যাপার। আমার কিছুই করবার নেই। আমি রিপোর্টটা পেলেই সন্তুষ্ট চিত্তে ঘরে ফিরে যাব। জালিয়াৎ ধরা আমার কাজ নয়, এর পিছনে যে পলিটিক্যাল মোটিভেশন কাজ করছে আমার ইন্টারেস্ট সেইখানে।'

'আপনার কাছে প্লেট দুটো ফেরত চেয়েছিল আহমদ শফিক ?'

'না। বলেছিল ওষুধ প্রয়োগ করে জেনে নেবে কোথায় আছে ওগুলো।'

'ওর ধারণা, আপনার কাছেই আছে প্লেট ?'

'সবারই তাই ধারণা দেখতে পাচ্ছি।' বাম হাতটা বার কয়েক ঝাড়া দিয়ে দু'বার ভাঁজ করল রানা। 'ঠিক হয়ে এসেছে প্রায়।'

'সত্যিই আপনার কাছে নেই ওগুলো ?'

'সত্যিই নেই, কিন্তু কাউকে বিশ্বাস করাতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। সবাই ভাবছে আমার ড্যানা ধরে আচ্ছা মত এক মোচড় দিলে বেরিয়ে যাবে প্লেটগুলো। খণ্ড খণ্ড কয়েকটা দলের টার্গেট হয়ে গেছি আমি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আসলে জিনিসটা নেই আমার কাছে অথচ কাউকে বিশ্বাস করান যাবে না···কিছুতেই প্রমাণ করতে পারব না···'

'যাবে। আমি বিশ্বাস করি যে ওগুলো আপনার কাছে নেই।'

'যাক!' হাঁপ ছাড়ল রানা। 'একজন শত্রু কমল।' মৃদু হেসে বলল, 'ধন্যবাদ।'

'তার মানে ?'

'মানে আপনি অন্ততঃ পিস্তল ধরবেন না আমার বুকের ওপর প্লেটগুলোর জন্যে।' হাসল রানা। 'এটুকু আমার

জন্যে এখন মস্ত ভরসার কথা। চারিদিকেই শত্রু দেখছিলাম, একটা দিক মিত্র না হোক, নিউট্রাল হয়ে গেল।'

খুলনা ক্লাবের সামনে দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে কনসাল কার্টিনা। এ ব্যাপারে কোন কথা হল না ওদের।

হোটেলের সামনে গাড়ী থামাতে নিষেধ করল রানা, গতি কমিয়ে পার হয়ে এল বেশ অনেক দূর। সন্দেহজনক কিছু দেখা গেল না আশেপাশে কোথাও। কিন্তু গেটের কাছে দাঁড়ান একজন লোকের দিকে চেয়েই চোখ সরিয়ে নিল ভৌমিক।

'চেনেন ওকে ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভাল মত। ওর নাম ইজ্জত আলী।'

'আচ্ছা। এই লোকটার সাথেই মারপিট হয়েছিল রাজেশ মল্লিকের সপ্তা দুয়েক আগে।'

তাজ্জব দৃষ্টিতে চাইল ভৌমিক রানার মুখের দিকে। একটা লাইট পোষ্টে গুঁতো খেতে খেতেও শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। গাড়ীটা থামিয়ে বলল, 'অনেক কিছুই জানেন দেখছি ?'

'এত অবাক হবার কি আছে ? রিতার কাছে শুনেছি।'

'ঠিকই শুনেছেন। খুব দুস্তি ছিল দুজনে। কিন্তু মারপিটের পর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আহমদ শফিকের কাজ ছেড়ে দিয়েছে রাজেশ ইজ্জতের মুখ দেখতে হবে বলে। ইজ্জত রয়ে গেছে মনিবের সাথেই।'

'কিম্বা এমনও হতে পারে, নকল মারামারি হয়েছিল

ওদের মধ্যে। এর ফলে কারো সন্দেহ উৎপাদন না করেই সরে আসতে পেরেছে রাজেশ মল্লিক এই ফ্যানাটিকের দল থেকে। গতিবিধির স্বাধীনতা পেয়েছে। আর ওর বন্ধু বা সহযোগী ইজ্জত আলী রয়ে গেছে দলের সাথে ভেতরের খবর ওকে জানানর জন্যে। ওরা হয়তো কিছু একটা প্ল্যান এঁটেছিল।'

গম্ভীর ভাবে রানার মুখের দিকে চেয়ে রানার বক্তব্য শুনছিল ভৌমিক, কথা শেষ হবার দশ সেকেণ্ড পর বলল, 'হতে পারে।' কেমন যেন চিন্তিত মনে হচ্ছে ওকে। হঠাৎ বলল, 'আবার ফিরে যাব হোটেলে?'

'না। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমি এখানেই নামব। কয়েকটা কাজ সেরে তারপর ফিরব হোটেলে। কয়েক জায়গায় ফোন করতে হবে। প্রয়োজন হলে কোথায় যোগাযোগ করব আপনার সাথে?'

'আমিই যোগাযোগ করব। শীগগিরই।'

নেমে দাঁড়িয়ে করমর্দন করল রানা ভৌমিকের সাথে।

গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল ভৌমিক শাহীন হোটেলের দিকে।

বার

রানার জুতোর সুখতলীর নীচে থেকে বেরোল একটা ছোট্ট গোল চাকতি। সেলোফেন পেপারে মোড়া কাঁচা টাকার সমান একটা শক্ত বোর্ড। এক পিঠে খুব ছোট ছোট অক্ষরে লেখা রানার স্পেশাল আইডেন্টিটি, অপর পিঠে ওর ছবি।

ওটা দেখেই অমায়িক হাসি দেখা দিল এস. পি. জহুরুল হকের মুখে।

'ব্যাস, ব্যাস। আর কিছু বলতে হবে না। বুঝে গেছি। আমার এখন কি করতে হবে বলুন।'

'আপাততঃ টেলিফোনটা ব্যবহার করতে দিতে হবে। তারপর আমার বক্তব্য বলব।'

'করুন।' হাত তুলে এবং সেই সাথে মাথা ঝুঁকিয়ে টেলিফোনের দিকে ইংগিত করল তরুণ এস. পি. সাহেব। 'আমি থাকব, না চলে যাব ঘর থেকে?'

'থাকুন।'

প্রথমেই রিং করল রানা শাহীন হোটেলে। আধ মিনিটের মধ্যেই সাতাশ নম্বর কামরার রিসিভার ওঠাল

কেউ, কিন্তু হ্যালো বা ঐ জাতীয় কিছু বলল না। দশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করে রানা বলল, 'রিতা?'

'আপনি কে বলছেন?' রিতার ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর।

'মাসুদ রানা।'

'ও! টেলিফোনে গলার স্বর অন্যরকম লাগছিল বলে চিনতে পারিনি। আপনি বেরিয়ে এসেছেন? কি করছেন, কোথায় আছেন এখন?'

'তোমার খুব কাছাকাছিই আছি। কি ব্যাপার? এত ভয় পাচ্ছো কেন? কোন গোলমাল হয়েছে কোথাও?'

'না। দরজা লাগিয়ে দিয়ে বসে আছি। কিন্তু বার বার টেলিফোন আসছে। অপরিচিত সব কণ্ঠস্বর নানান প্রশ্ন করছে। জানতে চাইছে আটরায় কি ঘটেছে। অনুনয় বিনয় করছে ওখানকার খবরের জন্যে।'

'আমাকে ধরে নেয়ার জন্যে যে কয়জন খুলনায় এসেছিল তাদের কাউকে দেখেছিলে ফিরে এসে?'

'ওরা ত লাউঞ্জে বসে গল্প করছিল। চারজন ছিল। আমাকে দেখেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। পানির গ্লাস উল্টে ফেলল একজন। কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সোজা চারতালায় উঠে এসে দরজা লাগিয়ে দিয়েছি। ওরাও এসেছিল, বার কয়েক ধাক্কাধাক্কির পর...'

'বেশ করেছ। এখন রাখি। আমি আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে।'

ক্রাডলে টোকা দিয়ে ঢাকার নাম্বারে রিং করল রানা।

আসলামের মৃত্যু থেকে নিয়ে সব ঘটনাই জানাল সংক্ষেপে। কয়েকটা ব্যাপারে নির্দেশ দিল। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে ফিরল জহুরুল হকের দিকে। হাঁ হয়ে গেছে এস. পি. সাহেবের মুখ।

'টেলিফোন থেকেই অনেকটা বুঝে নিয়েছেন নিশ্চয়ই। বাকিটুকু বলেই বিদায় নেব আমি। আপনার তরফ থেকে খুব দ্রুত কিছু এ্যাকশন দরকার এখন। বিরক্ত করলাম এত রাতে, সেজন্যে দুঃখিত।'

'আরে, না না। কী যে বলেন। ইট ইজ মাই ডিউটি।'

পনের মিনিট পর বেরিয়ে এল রানা এস. পি-র বাংলো থেকে। ততক্ষণে পুলিশ ব্যারাক এবং থানায় সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। ব্যস্ত হয়ে পড়েছে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্ট। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে এগোল রানা পায়ে হেঁটে। শাহীন হোটেলে পৌঁছে ইজ্জত আলীর দেখা পাওয়া গেল না। চারতালায় সাতাশ নম্বরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। টোকা দিল।

পিছন থেকে টোকা পড়ল রানার কাঁধে।

ঝট করে ফিরল রানা। দাঁড়িয়ে আছে ইজ্জত আলী। বেঁটে খাটো স্বাস্থ্যবান লোক, হাতে পয়েন্ট টু ফাইভ ক্যালিবারের একটা এ্যাসট্রা পিস্তল। নাকের ডানপাশ থেকে চিবুকের বাম পাশ পর্যন্ত একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন ঠোঁট দুটোকে দুই ভাগে ভাগ করেছে বাঁকা ভাবে।

'গোঃ গোঃ গোঃ গোহ্‌লমাল করবেন না। ভিতরে চলুন, কঃ কঃ কঃ...'

'কথা আছে,' বলল রানা।

ভিতর থেকে রিতার সাড়া পাওয়া গেল। 'কে?'

'আমি মাসুদ রানা। দরজা খোল রিতা।'

খটাশ করে খুলে গেল দরজা। রিতার উজ্জ্বল হাসিমুখ মুহূর্তে মলিন হয়ে গেল রানার পিছনে পিস্তলধারী ইজ্জত আলীকে দেখে। রানার পিছু পিছু ঘরে ঢুকে এল ইজ্জত আলী, রিতাকে দেখে একটু অবাক হল, দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে বলল, 'হ্যান্‌সাপ্‌!'

ওর কথায় কান না দিয়ে কোটটা খুলতে শুরু করল রানা। রিতাকে বলল, 'ব্ল্যাক ডগের বোতলটা বের কর দেখি। উফ্‌, বড্ডো ধকল গেছে সারাটা দিন।'

'হ্যান্‌সাপ্‌!' আবার বলল ইজ্জত আলী। 'ক-কৃকথা কানে যাঃ যাঃ...'

'যাচ্ছে না,' বলল রানা। 'কি কথা আছে বলে দূর হয়ে যাও। হাতটাত তুলতে পারব না। হাতে ব্যথা আছে।' টাইয়ের নট খুলে উপর দিকের তিনটে বোতাম খুলল রানা শার্টের। শোল্ডার হোলস্টারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওয়ালথার পি. পি.।

কি করবে বুঝতে পারছে না ইজ্জত আলী। ওর ইজ্জত নিয়ে টান পড়েছে। কারো দিকে পিস্তল তাক করে ধরলে যে সে এরকম ভাবে উপেক্ষা করতে পারে, এটা ওর কল্পনার

বাইরে ছিল। আত্মবিশ্বাস টলে গেল বেচারার। পিস্তলটা ধরেই রাখল রানার দিকে, কিন্তু চোখ দেখে মনে হচ্ছে অস্ত্রের উপর আর ভরসা করতে পারছে না সে।

'ক-কসম খোদার,' বলল ইজ্জত আলী, 'ইয়ার্কি না, গোলমাল করলেই গুলি করব। শত্রুতা না, প্যা-প্যা-প্যাক্ট করতে এসেছি আমি আপনার সাথে। আ-আপনি যা চান আমার কাছে আছে, আর আ-আমি যা চাই আপনার কাছে আছে।' পিস্তল দিয়ে খোঁচা দিল সে রানার পিঠে। 'প্লেট দুটো দিয়ে দিলেই...'

ঝট করে ঘুরেই প্রচণ্ড এক থাবড়া মারল রানা ইজ্জত আলীর নাকের উপর। হুড়মুড় করে একটা চেয়ারের উপর গিয়ে পড়ল লোকটা। দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে চটাশ চটাশ ছয়টা চড় কষাল রানা ওর গালে। দুই হাতে।

পিস্তলটা পড়ে গেছে হাত থেকে, চোখ উল্টে জ্ঞান হারাবার উপক্রম করতেই ওকে ছেড়ে দিয়ে আধ গ্লাস ব্ল্যাক ডগ ঢালল রানা একটা গ্লাসে, ঢক ঢক করে দুই ঢোকে গ্লাসটা শেষ করে ইজ্জত আলীর পকেট থেকে যাবতীয় জিনিস বের করে টেবিলের উপর রাখল। হঠাৎ বেল্টের নীচে নজর যেতেই ওখান থেকে টান দিয়ে বের করল একটা ছোট্ট নোট বই। দামী চামড়া মোড়া নোট বই।

'দাদার নোট বই!' বলল রিতা। রানা কয়েকটা পাতা উল্টাতেই বলল, 'দাদার হাতের লেখা!'

ইজ্জত আলীর বিভিন্ন পকেট থেকে বেরিয়েছে দুটো

পাসপোর্ট, আর তিনটে ভিজিট কার্ড। নাম আলাদা, কিন্তু ফটোর চেহারা এক। এছাড়া আর কিছুই নেই ইজ্জত আলীর কাছে। দেবাশীষের নোট বইয়ের তিন চতুর্থাংশ বিজবিজে লেখায় ভর্তি—কোডে লেখা, ডিসাইফার না করলে বুঝবার উপায় নেই। ইজ্জত আলীর দিকে ফিরল রানা। পিটপিট করে চাইছে লোকটা রানার দিকে।

'যা জিজ্ঞেস করব ঠিক ঠিক উত্তর না দিলে খুন হয়ে যাবে,' বলল রানা চোখ পাকিয়ে। গোল চাকতিটা দেখাল ওকে। 'দরকার মনে করলে মানুষ খুন করবার অনুমতি আছে আমার। একটু আগে তোমাদের চারজনকে খুন করে এসেছি, আরেকটা খুন করতে হাত কাঁপবে না আমার। সত্যি বলছ, না মিথ্যে বলছ বুঝতে পারব আমি। কাজেই সাবধান। বুঝেছ?'

মাথা নাড়ল ইজ্জত আলী।

'বেশ। প্রথমে বল, কে পাঠিয়েছে তোমাকে আমার কাছে?'

চুপ করে থাকল ইজ্জত আলী। ঠোঁট ভিজাল জিভ দিয়ে।

'উত্তর না দিলে এক রদ্দা মেরে ঘাড় মটকে দেব। তারপর ঐ জানালা দিয়ে নীচে ফেলে দেব। মনিবের জন্যে মরতে রাজি আছ?'

'না।' জবাব দিল ইজ্জত আলী। রানার প্রত্যেকটা কথা বিশ্বাস করেছে সে।

'বেশ। তাহলে বল কে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'আহম্মদ শফিক।'

ঝটাং করে এক থাবড়া পড়ল ইজ্জতের মুখে। দরদর করে পানি বেরিয়ে এল চোখ থেকে।

'কে পাঠিয়েছে?'

'মল্লিক। রা-রা-রা...'

'নোট বইটা সেই দিয়েছে তোমাকে?'

মাথা ঝাঁকাল ইজ্জত আলী। চোখ মুছল হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে।

'কার হয়ে কাজ করছ? আহমদ শফিক, না রাজেশ মল্লিক?'

খানিক্ষণ চুপচাপ। রানার হাতটা নড়ে উঠতেই জবাব এল, 'দুঃ দুঃ দুজনেরই।'

'রাজেশের সাথে কদিন আগের মারামারিটা কি নকল?'

চোখ পিট পিট করে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল ইজ্জত আলী।

'আহমদ শফিকের লোকজন দেখছি না কেন?'

'আছে। পঞ্চাশ জন লোক ঘি-ঘিরে আছে হোটেলটা। চারিপাশে।'

'নোট বইটা কখন দিল তোমাকে রাজেশ মল্লিক?'

'এই খা-খা খানিকক্ষণ আগে।'

'কি করতে বলেছে সে এটা নিয়ে?'

'এইটা দিয়ে প্লেট দু-দুটো নিয়ে যেতে বলেছে।'

রিতার দিকে ফিরল রানা। 'রিতা, কিছুতেই সত্যি কথা বলছে না ব্যাটা। তুমি একটু পাশের ঘরে যাও। খুন করে ফেলব আমি ওকে এখন।'

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল রিতা রানার মুখের দিকে দুই সেকেণ্ড। রানাকে আবছা ভাবে চোখ টিপতে দেখে বলল, 'ঠিক আছে, আমার সামনে মারলে কিছু হবে না।'

'উঁহু', তুমি সহ্য করতে পারবে না। এসব ব্যাপার মেয়েমানুষের না দেখাই ভাল। যাও।'

'আচ্ছা।'

রিতা পাশের ঘরে চলে গেলে ধীরে ধীরে ফিরল রানা ইজ্জত আলীর দিকে। ঘাম দেখা দিয়েছে ওর কপালে। ভয় পেয়েছে লোকটা। ওর নাকের কাছ দিয়ে দ্রুত একবার ঘুরিয়ে আনল রানা হাতটা। ককিয়ে উঠল ইজ্জত আলী।

'কি বলেছে রাজেশ মল্লিক?'

'বলেছে মারধোর করবেন আপনি। মেরে ফেলবেন, সে-সে-সেকথা বলেনি।'

'মারধোর করে তারপর কি করব বলেছে?'

'নো-নোট বইটা কেড়ে নিয়ে লা-লাত মেরে বের করে দেবেন ঘর থেকে।'

ফুঁ দিয়ে ছাতের দিকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। একটা সিগারেট ধরাল। বলল, 'আর কি বলেছে?'

'বলেছে প্লেট দুটো আপনার কাছে নেই। নো-নোট

বইটা পেলেই কেঃ কেঃ কেটে পড়বেন আপনি। ঝা-ঝা-ঝামেলা যাবে।'

'নোট বইটা পেলেই কেটে পড়ব একথা জানল সে কি করে?'

'জানি না।' রানাকে হাত তুলতে দেখে বলল, 'আল্লার কসম, জা-জা-জা-জা-জা-জা-জা-'

হেসে ফেলল রানা। 'দেবাশীষ আর রাজেশ মল্লিক গোপন চুক্তি করে প্লেট নিয়ে কেটে পড়ার প্ল্যান করেছিল?'

'আমিও।'

'দেবাশীষকে টানা হল কেন? তোমরা দুজন পারতে না কাজটা?'

'না। সিগন্যাল জা-জানা ছিল দেবাশীষ বাবুর, আম-আম্মাদের হাতে দিত না ভাটপাড়ার নি-নিযামুদ্দিন।'

খপ করে কলার চেপে ধরে টেনে তুলল রানা ইজ্জত আলীকে, ঠেলে নিয়ে গেল দরজা পর্যন্ত, দরজা খুলেই লাথি মারল ওর পিছন দিকে। ছিটকে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা করিডোরে। পড়েই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। উঠেই গালি দিল, 'কুত্তার বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ…'

রানাকে এক পা এগোতে দেখেই খিঁচে দৌড় দিল ইজ্জত আলী। সেই সাথে বাঃ বাঃ বাঃ করেই চলেছে।

দরজা বন্ধ করে দিল রানা।

তের

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল রিতা পাশের ঘর থেকে। পিস্তলটা তুলল কার্পেট থেকে।

'আচ্ছা জব্দ করেছেন লোকটাকে যাহোক। আমি ত ঘাবড়েই গিয়েছিলাম প্রথমে। কিভাবে ওদের হাত থেকে বেরোলেন বলুন তো···কি ব্যাপার, কি লিখছেন খাতায়?'

ইজি চেয়ারে শুয়ে দ্রুত হাতে দেবাশীষের নোট বইটার পাতা উল্টাচ্ছে রানা, কিছু কিছু অংশ ডিসাইফার করে লিখছে খালি পৃষ্ঠায়। ভ্রু জোড়া কুঁচকে গেছে ওর। গোটা কয়েক নাম দেখে চমকে গিয়েছে সে ভিতর ভিতর। রিসিভারটা তুলে নিল কানে।

'আমাকে ঢাকার টু ডাব্‌ল্‌ ফাইভ ডাব্‌ল্‌ থ্রি টুর কানেকশন দিন।'

'ডাইরেক্ট লাইনে অনেক খরচ যাবে স্যার।'

'আমার পকেট থেকে যাবে। আপনি রিং করুন।'

রিতার দিকে ফিরল রানা। 'চটপট দরকারী কয়েকটা জিনিস গুছিয়ে নাও ত রিতা। কিছুক্ষণের মধ্যেই পালাতে হবে আমাদের। পরে সব বলব তোমাকে, এখন সময় নেই।'

'ইয়েস। সাঈদা স্পিকিং।'

'দিস ইজ মাসুদ রানা দি গ্রেট। টেপ রেকর্ডারটা অন করে দাও ডার্লিং, আর্জেন্ট এ্যাণ্ড ইম্পর্ট্যান্ট মেসেজ পোরিং ইন।···রেডি ? নাউ ইট স্টার্টস্,···'

গড় গড় করে পড়ে গেল রানা দেবাশীষের নোট বইয়ের প্রতিটা শব্দ। খানিকক্ষণ হাঁ করে শুনল রিতা, কিছুই বুঝতে না পেরে মৃদু হেসে চলে গেল পাশের ঘরে।

দশ মিনিট পর থামল রানা 'ইমিডিয়েট এ্যাকশন সলিসিটেড' বলে। ক্র্যাডলে টোকা দিয়ে এস. পির নাম্বারে রিং করতে বলল সে অপারেটারকে। দুই মিনিটে কয়েকটা জরুরী প্রয়োজনের কথা জানাল রানা জহুরুল হককে, তারপর টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আরাম করে বসে সিগারেট ধরাল আরেকটা। রিতা এসে বসল সামনের চেয়ারে।

রানাকে কিছু বলবার উপক্রম করতে দেখে বলল, 'না। আপনি একটু বিশ্রাম করুন। গতকাল সন্ধ্যে থেকে একবিন্দু ঘুম বা বিশ্রাম হয়নি আপনার। খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকলেও অনেকটা ভাল লাগবে।'

'না ঘুমালে ক্লান্তি যাবে না আমার। কিন্তু আগামী কয়েক ঘণ্টা ঘুমের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। কথা বললে সময়টা বরং ভালই কাটবে। বল, কি জিজ্ঞেস করছিলে তুমি ?

'কি ভাবে বেরোলেন ওদের হাত থেকে ছুটে ?'

সংক্ষেপে বলল রানা।

'কিসের প্লেটের জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে ওরা?'

'টাকা ছাপার দুটো স্টীল প্লেট।'

'দাদা চুরি করেছে ওগুলো?'

'তোমার দাদার সাথে এসবের কতটা কি সম্পর্ক ঠিকমত বুঝতে পারিনি আমি এখনো। যখন বুঝতে পারব, তোমাকে জানাব। আসলে জটিল এক চক্রান্তের সাথে জড়িয়েছিল তোমার দাদা নিজেকে।'

'এরা কারা?'

'এরা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় অসন্তুষ্ট একদল লোক, আবার এক পাকিস্তানে ফিরে যাবার কষ্ট-কল্পনায় বিভোর হয়ে রাষ্ট্র বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়েছে। এদের সাথে যোগ দিয়েছে ভারতের একদল অসৎ মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ী। এরা টাকা ছেপে বাংলাদেশের সর্বনাশ করবার তালে আছে। এই হচ্ছে ব্যাপার।'

'দাদা শেষকালে এদের সাথে মিলে দেশের ক্ষতি করতে যাচ্ছিল?' বেদনায় ছেয়ে গেল রিতার মুখটা। 'অথচ আমার ধারণা ছিল, দাদার মত দেশপ্রেমিক···ছি, ছি···এই জঘন্য কাজ করতে গেল কেন দাদা।'

'আগেই বিচারের রায় দিয়ে বস না রিতা।'

'পরিষ্কার বুঝতে পারছি এখন। দাদা এদেশ ছেড়ে পালাতে চেয়েছিল। রাজেশ মল্লিকের সাথে প্ল্যান করে চোরের উপর বাটপারী করেছিল। শেষকালে সেই

রাজেশকেও ফাঁকি দিয়ে প্লেট দুটো নিজেই নিয়ে কেটে পড়ার মতলব করে মারা গেছে রাজেশের গুলিতে। ছি, ছি, ছি।'

রানা হাসল। 'আপন বোন হয়ে তুমিই যদি তোমার দাদা সম্পর্কে এ ধরনের কথা ভাবতে পার, তাহলে বাইরের লোক কতটা কঠোর কথা বলবে ভেবে দেখ।'

'আপনি কথা দিয়েছেন যতটা সম্ভব চেপে রাখবেন এসব।'

'চেপে আমার কিছুই রাখতে হবে না। আমার বিশ্বাস তোমার দাদা সম্বন্ধে তুমি যা ভাবছ তিনি তা ছিলেন না। ওঁর অনেকগুলো কাজের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। ভাল করে ভেবে দেখার সময়ও পাইনি। খুব সম্ভব ওগুলো জানার পর পরিষ্কার বোঝা যাবে তোমার দাদার উদ্দেশ্য। আগে থেকেই ছিছি শুরু করলে বিচারটা ভ্রান্ত, একপেশে হবে।'

'কিসের ব্যাখ্যা পাচ্ছেন না?'

'বর্ডার পেরোবার ব্যাপারে দেবাশীষ বাবু আমাদের সাহায্য কেন গ্রহণ করলেন?'

'নিরাপদে কাজটা সারবার জন্যে হয়তো। আপনাদের সাথে ঘনিষ্টতার সুযোগ নিয়েছে হয়তো দাদা। নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে।'

'কলকাতায় আমাদের এজেন্টের উপস্থিতি কামনা করেছিলেন কেন?'

'এই নোটবইটা দেবার জন্যে।'

'আমাকে ডেকেছিলেন কেন?'

'নিরাপত্তার জন্যে।'

'এই নোটবইয়ে কি আছে জানো?' মৃদু হাসল রানা। 'বাংলাদেশের একশো গণ্যমান্য লোকের নাম। অনেকগুলো হোমড়া চোমড়া উচ্চপদস্থ অফিসারের নামও দেখতে পাচ্ছি। এরা 'মুসলিম বাংলা' আন্দোলনের সাথে জড়িত; এদেরই সাহায্যপুষ্ট হয়ে নির্বিবাদে কাজ চালাচ্ছে ওরা বাংলাদেশের বুকে বসে বাংলাদেশেরই বিরুদ্ধে। এগুলো সংগ্রহ করতে মস্ত ঝুঁকি নিতে হয়েছিল দেবাশীষ বাবুকে, ধরা পড়লে প্রাণ যেত নির্ঘাৎ। বহুদিনের নিরলস চেষ্টায় এই লিস্ট তৈরি করেছেন উনি। ওঁর নিশ্চয়ই জানা ছিল, এই লিস্ট আমাদের হাতে এলে টাকা জালের সমস্ত ঘটনাই জানা হয়ে যাবে আমাদের। সেক্ষেত্রে প্লেট দুটো নিয়ে কি লাভ হতো ওঁর? কিছুতেই এই প্লেট ব্যবহারের সুযোগ পেতেন না উনি। তবু কেন চুরি করতে গেলেন?'

উত্তর দিতে পারল না রিতা, বোকার মত চেয়ে রইল রানার মুখের দিকে।

'তাছাড়া,' বলল রানা, 'আরো একটা প্রশ্ন আছে। গেল কোথায় ওদুটো? ভাটপাড়ায় প্লেট আর দুটো একশো টাকার স্যাম্পল্ নোট ডেলিভারী নিয়ে কলকাতার দিকে রওনা হলেন উনি, গোপনে উঠলেন গিয়ে বিল্টমোর হোটেলে। তারপরই খুন হয়ে গেলেন। নোট দুটো

পেলাম, কিন্তু কোথায় গেল প্লেট? ওঁর সঙ্গে ছিল না, কারণ পিছু ধাওয়া করে গিয়েও রাজেশ মল্লিক আসল জিনিস উদ্ধার করতে পারেনি। সবাই খুঁজছে এখন প্লেট দুটো। ভাটপাড়া থেকে কলকাতা যাওয়ার পথেই কোথাও লুকানো হয়েছে জিনিসটা। আমার মনে হয়, হয় খুবই নিরাপদ কোন জায়গা খুঁজে বের করেছিলেন উনি, নয়তো পোষ্ট করে দিয়েছেন ওগুলো ঢাকার ঠিকানায়।'

কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল রিতার দুই চোখে। রানার কথার যৌক্তিকতা অস্বীকার করবার উপায় নেই। মনের মধ্যে যে দেবতার আসনে বসিয়েছিল ও ওর দাদাকে, রানা যে তাকে ঠিক সেই আসনেই সম্মানের সাথে আবার প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছে, এটুকুতেই বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল রিতার বুক, কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল অন্তর।

ভড়কে গেল রানা। কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেলে বিপদ। কি বলবে বুঝে পাচ্ছে না।

টেলিফোনটা রক্ষা করলো রানাকে এযাত্রা। সময় মত বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং করে। ইশারায় রিসিভার তুলতে বলল রানা রিতাকে। দুই সেকেণ্ড কানে ধরেই বলল রিতা, 'আপনাকে চায়।'

পরিষ্কার ভেসে এল আহমদ শফিকের কণ্ঠস্বর।

'জনাব মাসুদ রানা, বুঝতেই পারছেন, আমাকে ধরার সাধ্য আপনাদের পুলিশ বাহিনীর নেই। ইতিমধ্যেই আমার দুই নম্বর আস্তানায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে মেশিন

পত্র সব। পুলিশ গিয়ে দেখবে দাউ দাউ করে জ্বলছে বাড়ীটা। কিছুই পাবে না সেখানে। আপনার এত কষ্ট সব বিফলে গেল, কি বলেন?'

'এত বাহাদুরীর কি আছে?' বলল রানা। 'আজ বেঁচে গেছেন, ধরা পড়বেন কাল বা পরশু। আমাদের অত তাড়াহুড়ো নেই।'

'যদি ধরা পড়ি, আপনি দেখে যেতে পারবেন না জনাব। আজই আপনার জীবনের শেষ দিন। যতটা পারেন আল্লা-খোদার নাম করে নিন, দুই ঘণ্টার মধ্যে হাজির হয়ে যাবে আজরাইল।'

'তাহলে ত পিস্তলটায় গুলি ভরে রাখতে হয়। মরতে আমার ভাল লাগে না।'

'ছেলেমানুষের মত কথা বলছেন। আমাদের শক্তি সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই বলেই। এই খুলনা শহরেই আমার আটশো লোক আছে, আমার এক কথায় যারা প্রাণ দিতে রাজি। সবাইকে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিয়েছি আমি। নিস্তার নেই আপনার।'

'এই কথা জানাবার জন্যেই ফোন করেছেন?'

'না। প্লেটদুটো দিয়ে দিলে মৃত্যুদণ্ডাদেশ তুলে নেব আমি। এটাই আপনার একমাত্র, এবং শেষ সুযোগ।'

'লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু আপনাকে কোথায় পাব যে দেব ওগুলো? তাছাড়া আপনার কথা আপনি রাখবেন তার নিশ্চয়তা কি?'

'আমার মতাদর্শ আপনার থেকে ভিন্ন হতে পারে জনাব মাসুদ রানা, কিন্তু একটা কথা বিশ্বাস করতে পারেন, আমি বেঈমান নই। আমার কথায় রাজি থাকলে বলুন, আমি ওগুলো আনিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করি। আপনার কাছেই আছে, না আর কোথাও?'

'আমার কাছে নেই।' অবাক হল রানা আহমদ শফিকের মনের জোর দেখে। এতই নিঃসন্দেহ সে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে যে ধরেই নিয়েছে এই হুমকির সামনে নতি স্বীকার করতে বাধ্য রানা। আর কোন উপায় নেই রানার ওর কথামত কাজ করা বা মৃত্যু বরণ করা ছাড়া।

'ঠিক আছে, আমি আধঘণ্টা পর ফোন করে জানাব কিভাবে সংগ্রহ করা হবে ওগুলো আপনার কাছ থেকে। ততক্ষণ হোটেলেই থাকবেন।' হঠাৎ মনে পড়ল ওর রানা ওর প্রস্তাবে রাজি আছে কিনা সেকথাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। 'আমার প্রস্তাবে রাজি আছেন?'

'রাজি না হয়ে আর কোন উপায় আছে?' বলল রানা মৃদু হেসে।

'বেশ। অপেক্ষা করুন, আমি আবার ফোন করে জানাব কি করতে হবে আপনাকে। ইতিমধ্যে পালাবার বা পুলিশের সাহায্য নেবার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না। পুলিশের সাধ্যও নেই আপনাকে রক্ষা করে। কারো সাধ্য নেই। আমার লোক রয়েছে আপনার আশে পাশেই।'

রানাকে আর কোন কথার সুযোগ না দিয়েই কানেকশন কেটে দিল আহ্মদ শফিক। কান থেকে সরিয়ে মৃত রিসিভারটার দিকে চেয়ে রইল রানা কয়েক সেকেণ্ড। তারপর নামিয়ে রাখল। ভ্রু কুঁচকে ভাবছে রানা।

একতরফা কথা শুনেও সবই বুঝতে পেরেছে রিতা। বলল, 'প্লেট কোথা থেকে দেবেন আপনি ?'

চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যাওয়ায় একটু যেন চমকে গেল রানা। তারপর আবার গা এলিয়ে আরাম করে বসল ইজিচেয়ারে। আবার প্রশ্ন করল রিতা, 'কি করবেন এবার ?'

'পালাব। এছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।'

'এই ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকলে ওর হাত থেকে বাঁচা যাবে না ?'

'না। থানায় চারিপাশে পুলিশ দিয়ে ঘেরা অবস্থায় বসে থাকলেও না। সবখানে লোক আছে ওদের। আগামী তুইদিনেই ধরা পড়বে সব। কিন্তু এই তুটো দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে আমাদের।'

'আমাকে কেন পালাতে হবে ? আমি ত কিছুই জানি না এসবের ব্যাপারে ?'

'তোমাকে কেন ধরে নিয়ে গিয়েছিল ? তুমি জান যে তুমি জান না। কিন্তু ওদের ধারণা অন্য রকম। বিধর্মী এক অভিভাবকহীন মেয়ে তুমি, ওদের বিবেকে বাধবে না— শুধু খুন কেন, অনেক কিছুই করবে ওরা তোমাকে হাতে পেলে। তুমি ইচ্ছে করলে থেকে যেতে পার

এখানে, কিন্তু আমি পালাচ্ছি আধঘণ্টার মধ্যেই।'

'আমাকে ফেলে?'

'ফেলে নয়। রেখে। ইচ্ছে করলে আমার সাথে আসতে পার তুমি। কিন্তু সেক্ষেত্রেও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারব না। আমি ঝুঁকি নিচ্ছি, ইচ্ছে করলে তুমিও নিতে পার।'

'ঝুঁকি-টুকি বুঝি না, আমাকে ফেলে কোথাও যেতে পারবেন না আপনি। মরলে একসাথে মরব, বাঁচলে একসাথে বাঁচব।'

ইজি-চেয়ারের হাতলের উপর এসে বসল রিতা। চোখে চোখে চেয়ে রইল দুজন। চকচক করছে রিতার আয়ত চোখের মণি দুটো। গড়িয়ে চলে এল রানার বুকের উপর। পাগলের মত নাকে-মুখে-ঠোঁটে-চিবুকে-গলায় চুমু খেতে শুরু করল রিতা। অস্থির ভাবে গাল ঘষল রানার গালে। রানার হাত দুটো চলে এল রিতার পিঠে, ঠোঁট দুটো পেয়ে গেল ঠোঁট। গাল দুটো গরম হয়ে উঠেছে রিতার, শ্বাস পড়ছে দ্রুত। মুখটা সরিয়ে নিল একপাশে।

'আমাকে ছেড়ে যাবে না তুমি, বল···আমিও যাব তোমার সাথে রানা।'

বুকের উপর রিতার নরম চাপ, একগুচ্ছ খোলা চুল সুড়সুড়ি দিচ্ছে গলায়, মিষ্টি একটা সেন্টের সুবাস। মদির দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছে রিতা রানার চোখে।

'তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ রিতা।'

'চিরকাল ছোট্ট খুকিই থাকব বুঝি? মেয়েমানুষ ত কুড়িতেই বুড়ি।'

চুম্বকের আকর্ষণে নেমে এল আবার রানার ঠোঁট। দুই মিনিট চুপচাপ। তারপর মুচকি হেসে বলল রানা, 'কাল স্বপ্নের ঘোরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিলে···আজ লজ্জা লাগছে না?'

'না। লজ্জা ভেঙে দিয়েছ তুমি।' রানার বুকে মুখ লুকাল রিতা।

ঠক্ ঠক্ ঠক্। টোকা পড়ল দরজায়।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রিতা রানার বাহুবন্ধন ছিন্ন করে। ব্লাউসের দুটো বোতাম খুলে গিয়েছিল, লাগিয়ে নিল চটপট, আঁচলটা ঠিক করে নিল।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল রানা।

ঘরে প্রবেশ করল দুইজন ইউনিফরম পরা বেয়ারা।

চোদ্দ

দশ মিনিট পর চারতালার সাতাশ নম্বর কামরা থেকে বেরিয়ে গেল দুজন বেয়ারা। দুজনের হাতে দুটো দুটো চারটে কাপড়ের গাঁটরি। লণ্ড্রীতে যাচ্ছে কাপড়, বেডশীট, টেবিল ক্লথ, ন্যাপকিন, মশারী, বালিশের ওয়াড়।

হোটেলের পিছন দিকের উঠোনে দাঁড়ান একটা ঝকড়ে ভ্যানে তোলা হবে ধোবা বাড়ীর কাপড়। ধোয়া কাপড় নামান হলেই উঠবে এগুলো। ওঠান-নামানর ফাঁকে প্রথমে একজন, পরে অপরজন রয়ে গেল ভ্যানের ভিতর। ড্রাইভার নেমে বেরিয়ে গেছে হোটেল থেকে অন্য পথে—ছদ্মবেশে। মিনিট দশেক পর স্টার্ট নিল ভ্যান। খানিকটা ব্যাক করে ধীর গতিতে বেরিয়ে গেল পিছনের গেট দিয়ে। কয়েকটা গলিঘুঁচি পেরিয়ে চলে এল খান জাহান আলী রোডে, সেখান থেকে আরো এগিয়ে ধরল যশোর রোড। স্পীড উঠে গেল পঞ্চাশে।

পিছন থেকে টপকে চলে এল রিতা সামনের সীটে।

'আরে! এরই মধ্যে শাড়ী পরে নিয়েছ আবার?' বলল রানা।

'আপনি বেয়ারার পোষাক ছেড়ে ড্রাইভার হয়ে গেলেন, তাই আমিও রিতা হয়ে গেলাম।'

'আবার আপনি কেন?' কনুই দিয়ে গুঁতো মারল রানা ওর পাঁজরে। 'খুন করে ফেলব!'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল রিতা। তারপর ফিরল রানার দিকে।

'আচ্ছা, আমাদের বদলে বেয়ারা দুজন মারা পড়বে না ত?'

'না, ওরা বেরিয়ে যাবে খানিক পরেই।'

রাত দেড়টা। মেঘবৃষ্টি কখন উড়ে গেছে হাওয়ায়। চাঁদ উঠেছে বড় করে। মায়াময় দেখাচ্ছে চারিটা দিক মোলায়েম আলোয়। স্টিয়ারিং ধরে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে রানা সামনের দিকে। হাওয়ায় উড়ছে রিতার চুল।

'কোথায় চলেছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল রিতা।

'যেদিকে দুচোখ যায়। যতদূরে সম্ভব। হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত, সেটা যখন সম্ভব নয়, নিরাপদ কোন জায়গা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। মেইন রোড ধরে বেশিদূর যাওয়া যাবে না।'

'এখনো ভয় আছে?' অবাক হয়ে রানার মুখের দিকে চাইল রিতা। 'ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে এতদূর চলে এসেছি, তার পরেও ভয়?'

'সময় বিশেষে ভয় পাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। হঠাৎ রানা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, রিতা, বিল্টমোর হোটেলের ঠিকানা তুমি পেয়েছিলে একটা কাপড়ের দোকানে। দোকানের ম্যানেজার তোমাকে একটা খাতা দিয়েছিল—সেই খাতাটা কোথায়?'

'ওটা ত আমার সাথেই ছিল, দেখোনি?' লজ্জা পেল রিতা, 'ঐ যে বেতারশিল্পী লেখা ছিল যেটার উপর।'

'ও ঐ গানের খাতাটা?'

'হ্যাঁ। আমি গান গাই, আর গর্বে দাদার মাটিতে পা পড়ত না। যেখানে সেখানে আমার নামের পাশে লিখত বেতারশিল্পী। চিঠি লিখলে তাতেও। হোস্টেলে দারুণ লজ্জায় পড়তে হত এজন্যে।'

এসব কথা কানে ঢুকছিল না রানার। অন্যকিছু ভাবছে সে। বলল, 'তোমারই গানের খাতা তুমি পেলে শ্যাম-বাজারের কাপড়ের দোকানে. এটা কি রকম কথা হল?'

'ওটা ব্যবহার করেছিল দাদা পরিচিতির সুবিধের জন্যে? ওটা একটা পুরোন খাতা।'

'তোমার কাছ থেকে কবে চেয়ে নিয়েছিল দেবাশীষ বাবু খাতাটা?'

'কেন, খাতার ওপর চোখ পড়ল কেন আবার?'

'উত্তর দাও।'

'মাসখানেক আগে। এখন মনে পড়ছে, দাদা বলেছিল ঐ খাতার একাত্তুর পৃষ্ঠায় লেখা থাকবে দাদার ঠিকানা। সেখানে যদি তাকে না পাই, বাংলাদেশ মিশনের একজন

লোকের ঠিকানা পাওয়া যাবে ওটার উনআশী পৃষ্ঠায়, সেই লোকের কাছে গিয়ে এই খাতাটা দেখালেই সে বলতে পারবে দাদা কোথায় আছে। ভুলেই গিয়েছিলাম।'

একটা সিগারেট ধরাল রানা। চুপচাপ ধূমপান করল দুই মিনিট। তারপর হেসে উঠল আপন মনে। ঝট করে চাইল রিতা রানার মুখের দিকে।

'কি হল?'

'খাতাটা হোস্টেলেই আছে ত?'

'হ্যাঁ। আমার ব্যাগের ভেতর। খাতাটা নিয়ে হঠাৎ এমন পাগল হয়ে উঠলে কেন?'

আরো আগেই পাগল হওয়া উচিত ছিল, রিতা। যাক, ওটা নিরাপদেই আছে যখন, চিন্তা নেই। থাকুক ও দুটো তোমার ব্যাগের ভেতরেই।'

'তার মানে, তুমি বলতে চাও…'

'হ্যাঁ। প্লেট দুটো কোথায় আছে জানি আমি এখন। তোমার দাদার সম্পর্কেও নির্দ্বিধায় জবাব দিতে পারব আমি এখন যে কোন প্রশ্নের।'

'প্লেট দুটো কোথায়?'

'তোমার গানের খাতার কাভারের ভেতর। খাতাটা আগের চেয়ে একটু বেশি ভারি মনে হয়নি তোমার কাছে?'

'খেয়াল করিনি। ভালমত বুঝতে পারছি না আমি রানা। প্লিজ, একটু বুঝিয়ে বল হেঁয়ালী না করে।'

'দেবাশীষ বাবু বহু আগে থেকেই প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে রেখেছিল বোঝা যাচ্ছে। তোমার গানের খাতার মোটা কাভারের ভেতর পকেট তৈরি করিয়েছিল প্লেটগুলোর জন্যে। গানের খাতা নেওয়ার কারণ হচ্ছে, রাজেশ মল্লিকের জানা আছে যে তুমি গান গাও, কাজেই তোমার কাছে গানের একটা খাতা থাকাটা অস্বাভাবিক ঠেকবে না ওর কাছে। তাছাড়া তোমরা দুজন দুই জায়গা থেকে কলকাতায় পৌঁছেছ, তুমি যে তোমারি গানের খাতা সংগ্রহ করেছ শ্যামবাজারের আনন্দ ক্লথ মার্চেন্টের কাছ থেকে, এতটা কল্পনা করতে পারবে না রাজেশ মল্লিক—যদি তোমার জিনিসপত্র সার্চও করে গানের খাতাটা ভাল করে দেখবে না ও, মনে করবে তুমি তোমার গানের খাতা সাথে সাথেই রাখ, খুলনা থেকে ঢাকা এবং ঢাকা থেকে কলকাতায় বয়ে নিয়ে এসেছ। ঠিক তাই হয়েছে। তোমার ব্যাগটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পায়নি রাজেশ প্লেট দুটো। আমিও না। নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল ওগুলো তোমার গানের খাতার ভেতর শুয়ে।'

'বাংলাদেশ মিশনের সেই ভদ্রলোকের ঠিকানা দেয়া হয়েছিল কেন?'

'তাকে নিশ্চয়ই আগে থেকে বলা ছিল যে তুমি খাতা নিয়ে হাজির হলে যেন কাভার দুটো পরীক্ষা করে দেখে। এবং তার মৃত্যু সংবাদ তোমাকে জানায়। তোমার

নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবার অনুরোধও নিশ্চয়ই করেছিল সে তাকে।'

'দাদা জানত যে মারা যাবে?'

'তাই ত মনে হচ্ছে। এমন ভাবে সব ব্যাপার সাজান হয়েছিল যেন যে করে হোক, হয় প্লেট নয় নোটবইটা আমাদের হাতে পৌঁছোয়। ভাবছি, যে মানুষ এতদূর পর্যন্ত দেখবার ক্ষমতা রাখে, যার মাথায় এত সুন্দর প্ল্যান আসে, সে নিজের নিরাপত্তার জন্যে কোন রকম ব্যবস্থা নেয়নি কেন? জেনেশুনে নিজেকে খুনের টার্গেট বানিয়েছে সে। আত্মহত্যার মত লাগছে আমার ব্যাপারটা। প্লেনের টিকেটেও দেখ, তোমার আর আমার নাম। তার নিজের টিকেট করেনি সে। আমাকে ডাকা হয়েছিল তোমার নিরাপত্তার জন্যে, দেবাশীষ বাবুর নিজের জন্যে নয়। সে জানত তাকে মেরে ফেলা হবে. জেনেশুনেই হত্যা করবার সুযোগ দিয়েছে সে শত্রুপক্ষকে।' চুপ করে থাকল রানা পনের সেকেণ্ড, তারপর আপন মনেই প্রশ্ন করল, 'কেন?'

আধ মিনিট চুপচাপ। নীরবতা ভঙ্গ করল রিতা। 'বৌদিকে শায়েস্তা করার জন্যে?'

'হতে পারে! হয়ত অসহ্য হয়ে উঠেছিল জীবনটা তার। হয়ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, এই ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। ঠিক জানি না। তবে এটুকু জানি, নিজেকে রক্ষা করবার মত বুদ্ধিমত্তা ছিল দেবাশীষ

বাবুর। ইচ্ছে করলেই বাঁচতে পারতেন। কিন্তু সে ইচ্ছে করেননি উনি।'

আটরা, ফুলতলা ছাড়িয়ে এসেছে ওরা অনেকক্ষণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল যশোর। কিন্তু থামল না রানা। ছুটল ভ্যান ঝিনাইদহের দিকে, উত্তরে। পোনে একঘণ্টা পর পৌঁছল ঝিনাইদহে। সেখানেও থামল না। কুমারখালী হয়ে পাবনা যাবার রাস্তায় চলল আরো উত্তরে। ঝড়ের বেগে। রাস্তাঘাট জনশূন্য। রাস্তা পেরোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ান এক আধটা শেয়ালের জ্বলন্ত চোখ চোখে পড়ছে। এছাড়া ঘুমিয়ে আছে সবাই যেন নিঝুম ঘুমে।

রাত ঠিক পোনে তিনটায় পৌঁছল ভ্যান গোরাই নদীর ফেরীঘাটের কাছে। ওদিকে না গিয়ে ডান দিকের একটা কাঁচা রাস্তা ধরল রানা। দু'পাশে ধূ ধূ মাঠ। লোকালয় নেই কাছেপিঠে। কাঁচা রাস্তা ধরে মাইলখানেক এঁকেবেঁকে গিয়ে আবার নদী। আরো আধমাইল বাঁয়ে এসে একটা জায়গা পছন্দ হল রানার। ঝোপের ধারে এমন ভাবে আড়াল করে রাখল গাড়ীটা যেন রাস্তা থেকে কারো চোখে না পড়ে। দিনের বেলা চিন্তা নেই, প্রয়োজন হলে মোকাবেলা করবে শত্রুর, কিন্তু রাতটুকু লুকিয়ে কাটাতে হবে।

অসম্ভব ক্লান্তি। পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে বসে বসে গাড়ীর ঝাঁকুনি খেয়ে। ভ্যান থেকে নেমে পড়ল দুজনই। খাড়া পাড় বেয়ে নেমে গেল নদীর ধারে। হাত-মুখ ধুয়ে নিল নদীর ঠাণ্ডা জলে। চাঁদটা হেলে গেছে পশ্চিমে।

অসংখ্য তারা জ্বলজ্বল করছে সারাটা আকাশ জুড়ে। প্রাণ জুড়োন শীতল হাওয়া। নদীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা কিছুক্ষণ। কান পেতে শুনল নদীর উচ্ছ্বাস, জলকল্লোল। আঁচল উড়ছে রিতার, খসে যেতে চাইছে কাঁধ থেকে। কয়েকগুচ্ছ অবাধ্য এলোচুল বাগ মানছে না। খুলনার বিভীষিকা থেকে এতদূরে সরে এসে হাল্কা হয়ে গেছে ওর মনটা। দূর হয়ে গেছে সমস্ত ভয় ভাবনা। গুন-গুন গান গাইছে আপন মনে।

বনেটের উপর আধ-শোয়া হয়ে বসে আজকের শেষ সিগারেটটা ধরাল রানা। পাশেই দাঁড়িয়ে রিতা। টুকিটাকি দুএকটা কথা হচ্ছে ওদের। অপ্রয়োজনীয় কথা। রানার কাঁধের উপর হাত রেখে ঘাড়ের পিছনের চুলগুলোয় আংগুল বুলাচ্ছে রিতা। রানার একটা হাত রিতার কটিতে। মৃদু আদরে পাশ ফিরল রিতা।

'না। তোমার বিশ্রাম দরকার। বরং খানিক ঘুমিয়ে নাও রানা, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি আমি।'

শুনল না রানা। চাঁদের আলোয় চকচক করছে রিতার চোখদুটো। 'এ্যাই যাহ্, সুড়সুড়ি লাগছে।' হেসে উঠল খিল খিল করে। 'বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে।'

'দেখি?'

'যাহ্, দুষ্টু, অসভ্য কোথাকার!'

ক্রমে আধবোঁজা হয়ে এল রিতার আয়ত দুই চোখ।

টেনে তুলে নিল রানা ওকে বনেটের উপর। কয়েকটা মুখর মুহূর্ত কেটে গেল নিঃশব্দে।

পাগল হয়ে উঠল রিতা।

রানার হাত ধরে টানল। 'চল, শুয়ে পড়বে।'

ভ্যানের পিছনে উঠে এল ওরা। ক্যাঁচম্যাচ করে আপত্তি জানাল শক এ্যাবযর্বার। কিন্তু কোন আপত্তি শুনল না ওরা।

বাইরে উথাল পাথাল হাওয়া। নদীর তীরে ঢেউয়ের কুল কুল ছলাৎ। চাঁদের আলো।

কনুয়ের উপর ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করে রেখেছে রিতা পাশ ফিরে. বাম হাতটা বুলাচ্ছে রানার চুলে চিরুণীর মত। খোলা দরজা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে রানার মুখে। দুচোখ ভরে দেখছে রিতা নিষ্ঠুর লোকটাকে। রাত চারটা।

ঘুমে জড়িয়ে এসেছিল রানার চোখ, হঠাৎ রিতার কি একটা অস্ফুট কথায় সচেতন হয়ে বলল, 'কি বললে, রিতা?'

'বললাম, এরই নাম প্রেম।' আলতো করে চুমো খেল রানার ঠোঁটে। 'আমি জানতাম না।'

খানিকণ চুপচাপ কাটল। দূরে কোথাও কোকিল ডাকছে।

'অবশ্য ঠিক কুমারী মেয়ে আমাকে বলা যায় না। আর একবার হয়েছিল। তিন বছর আগে।'

হঠাৎ মনে মনে চমকে উঠল রানা। চোখের সামনে ভেসে উঠল শিবানীর ঈর্ষায়, অপমানে আর ঘৃণায় বিকৃত হয়ে যাওয়া চেহারাটা। স্পষ্ট শুনতে পেল শিবানীর কণ্ঠস্বর —কপাল ভাল ছুঁড়ির, ওর ভাইয়ের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল না বলে বাচ্চা আসেনি পেটে।

'বৌদির মাসতুত...'

'থাক রিতা। পুরোন কথা সব চুলোয় যাক।'

'সব বলতে ইচ্ছে করছে তোমাকে। মনে হচ্ছে আমার সম্পর্কে সব-কিছু জানবার অধিকার আছে তোমার। না বললে কেমন বাধো বাধো ঠেকছে। হাল্কা হতে পারছি না।'

'বাদ দাও রিতা। আমি সাইকিয়াট্রিষ্ট নই, সব কথা আমাকে না বললেও চলবে।'

কিন্তু বলেই চলল রিতা। 'সতের বছর বয়স। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি এসবের কিছুই জানতাম না তখন। বাচ্চা পেটে আসার বয়স হয়ে গেছে সেই কবে, অথচ সেক্স সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই আমার। বিশ্বাস হয়?'

'হয়। অল্প বয়সে মা মারা গেলে হতে পারে এরকম। অসম্ভব নয়। কিন্তু, রিতা...'

'বৌদির মাসীর বাড়ীতে আমাদের খুব যাওয়া আসা ছিল, মহিলা মায়ের মত আদর করতেন আমাকে। ওঁরই বড় ছেলে নিতুন দার বিয়ে। সারাদিন বিয়ে বাড়ীর হৈ-চৈ। মহা ফুর্তি। মজা। ন'টার দিকে যখন মন্ত্র পড়ান হচ্ছে,

একটা থামের আড়াল থেকে চুপিচুপি হাতছানি দিয়ে ডাকল আমাকে স্বপন দা। মাসীর মেজ ছেলে, আমার সমানই হবে, বা এক-আধ বছর বড়ও হতে পারে। আমাকে বলল, একটা মজার জিনিস দেখবি? আমি বললাম দেখব। তাহলে ছাতে চল্। ভারি মজার জিনিস। ধিংগি মেয়ে কিচ্ছু বুঝিনি, চললাম নাচতে নাচতে।'

'তারপর নিশ্চয়ই তোমাকে বলল, নিতুন দা আর তার বউ আজ রাতে এক মজার খেলা খেলবে, ইত্যাদি ইত্যাদি, তারপর সেই গত বাঁধা কাহিনী।'

'হ্যাঁ। আমাকে বলল ওরা আজ কি করবে জানিস? আমি বললাম ঘুমাবে। ও বলল, দুর তুই কিচ্ছু জানিস না। আয়, তোকে দেখাচ্ছি। প্রথমে চুমো খেল, তারপর গায়ে হাত দিল স্বপন দা। দেখলাম সত্যিই মজা ত! প্রথম দিকে ছোঁয়াছুঁয়িগুলো বেশ ভালই লাগছিল, কিন্তু শেষেরটুকু আমার মোটেই ভাল লাগল না। বললাম ওকে, দুর, এতে কি মজা? কেমন নোংরা নোংরা লাগছে। ও বলল, তোর ভাল লাগেনি? আমার কিন্তু দারুণ লেগেছে। কাল সন্ধ্যের সময় আসিস আমার ঘরে, দেখবি তোরও ভাল লাগবে। আসলে প্র্যাকটিস দরকার...'

খিল খিল করে হেসে উঠল রিতা। 'আর প্র্যাকটিস করবার সুযোগ পাইনি। পরদিনই একটা বই কিনে এনে দিল দাদা।'

দাদার কথায় আবার আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা। খানিক

চুপ করে থেকে আবার শুরু করল রিতা।

'বইটা পড়ে দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম। পড়ার আগে পর্যন্ত আমি এটাকে মজার খেলাই মনে করেছিলাম। ভীষণ কৌতুহল হয়েছিল ব্যাপারটা সম্পর্কে। বৌদি ঝগড়া করে একাই চলে এসেছে বিয়ে বাড়ীতে। ভাবলাম দাদাকে জিজ্ঞেস করি গিয়ে। সোজা বাড়ী ফিরে এসে ঢুকলাম দাদার ঘরে। দেখি ঘুমাচ্ছে দাদা বেঘোরে। পাশে মদের বোতল। অনেক ধাক্কাধাক্কি করে তুললাম। বললাম সব। প্রথম দিকে কিছুই বুঝতে পারছিল না দাদা। হুঁ হাঁ করে আবার ঘুমাবার তাল করছিল। কিন্তু আমার দুই একটা কথা কানে যেতেই সজাগ হয়ে উঠল। প্রথমে তাজ্জব হয়ে গেল। বলল, এ তুই কি বলছিস রিতা! বললাম খুব খারাপ লাগেনি আমার কাছে, স্বপন দা বলেছে, প্র্যাকটিস করলে নাকি খুব ভাল লাগে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানান প্রশ্ন শুরু করলাম। দাদা কোন কথাই শোনে না, শুধু এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ে, আর বলে, হায় হায়, তুই কিচ্ছু জানিস নারে বোকা। তোর বৌদি কিছুই শেখায়নি তোকে? বলে দেয়নি কিসে কি হয়? বলতে বলতে চোখ বুঁজে আসছে দাদার। আবার ধাক্কা দিতেই বলল, ঠিক হয়ে যাবে, ভাবিস না। কিসের কি ঠিক হবে বুঝতে না পেরে রেগে উঠলাম, মাতাল ব্যাটা একটা কথাও শুনছে না। চলে যাচ্ছিলাম, টের পেয়ে হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল, বলল, তোর বৌদির উচিত ছিল সব বুঝিয়ে দেয়া, আমি দাদা হয়ে কি করে তোকে এসব কথা

বোঝাই বল্ ত। ঠিক আছে, কাল একটা বই কিনে দেব, পড়লেই সব জানতে পারবি। আমি আবার বিয়ে বাড়ীতে যাচ্ছি শুনে কিছুতেই যেতে দিল না দাদা, বলল, এখানেই শুয়ে পড়।

'নেশার ঘোরে আর চোখ খুলে রাখতে পারছিল না দাদা, ঘুমিয়ে পড়ল আবার। আমি শুয়ে শুয়ে বহুক্ষণ আলোচনা করলাম ব্যাপারটা মনে মনে, এমন সব প্রশ্ন মনের মধ্যে আসতে শুরু করল যার উত্তর আমার জানা নেই। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম এক সময়।'

প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। মৃদুহাসি দেখা দিল ঠোঁটে। কথা বলেই চলল রিতা।

'দাদা নিশ্চয়ই সব কথা বলেছিল বৌদিকে, পরদিন বৌদি আমাকে নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে। আমাকে পরীক্ষা করে বৌদিকে কি কি সব বলল ডাক্তার আড়ালে ডেকে নিয়ে। ফিরে এলাম। সেই দিনই দাদার সাথে মহা ঝগড়া হয়ে গেল বৌদির। খুব সম্ভব আমাকে নিয়েই। সন্ধ্যেবেলা একটা মোটা সোটা কভার মোড়া বই এনে দিল দাদা আমাকে।'

'এ ব্যাপারে তোমার বৌদির সাথে আর কোন কথা হয়নি তোমার?'

'না। কেন?'

'সবটা ব্যাপার এবার অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে

আমার কাছে। ইচ্ছে করেই তোমার দাদা তোমার বৌদিকে সুযোগ দিয়েছে তাকে ব্ল্যাকমেইল করবার।'

'কি রকম ?'

'প্রথমে টাকাপয়সার টানাটানি পড়ছে, এরকম ভান করেছিল তোমার দাদা। ওঁর মৃত্যুসংবাদ প্রচার হওয়ার পরপরই খুব সম্ভব জানতে পাবে তোমার নামে প্রচুর টাকা রেখে গেছে তোমার দাদা। অসচ্ছলতার ভান করেই আসলে এই দলে ঢুকেছিলেন তোমার দাদা। তোমার বৌদির হাতে ব্ল্যাকমেইল করবার অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন।'

'ব্ল্যাকমেইলের অস্ত্র ?'

'হ্যাঁ। শিবানীর ধারণা, সেই ঘটনাটা ঘটেছিল তোমার দাদার সংগে। দাদার সাথে গোপন প্রেম ছিল তোমার। এখনো বিশ্বাস করে সে এই কথা। দেবাশীষ বাবু ওর এ ভুল ভেঙে দেয়ার চেষ্টা করেনি কখনো। ওর স্ত্রী যখনই ভয় দেখিয়েছে, সব কথা প্রকাশ করে দেবে, তখনই ভয় পাওয়ার ভান করেছে সে।'

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রিতা আধমিনিট। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'ছি, ছি! এই কথা ভেবেছিল বৌদি সে রাতে! ছি, ছি, ছি, ছি, ছি। এই ভয়ংকর অপবাদ সহ্য করেছে দাদা মুখ বুঁজে!'

'উদ্দেশ্য ছিল। সমস্ত ব্যাপারটাই সাজান গোছান, প্ল্যান করা।'

ভোর হয়ে আসছে। শেষ রাতের বাতাস ঠাণ্ডা। একবার শিউরে উঠল রিতা। কাঁটা দিয়ে উঠল সারা গা। আপাদমস্তক দেখল রানা ওকে। সারা শরীরে বস্ত্র বলতে মাথার ডানপাশে এবং পিছনে দুটো সার্জিকাল টেপ। লাগিয়ে দিয়েছিল রানাই।

'শীত করছে?'

মাথা নাড়ল রিতা। ওকে কাছে টেনে নিল রানা। খানিক বাদেই এল মধু বসন্ত। আর একটু পর এল গ্রীষ্মের রুদ্র উত্তাপ। তারপর এল বর্ষা। সিক্ত হয়ে গেল রিতার অন্তর।

দুচোখ বেয়ে নামল আনন্দাশ্রু।

সকাল হয়ে গেছে। রানার বাহুতে মাথা রেখে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে রিতা। অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে রানাও। খুট করে শব্দ হল কাছেই কোথাও।

মুহূর্তে সজাগ, সচেতন হয়ে কান খাড়া করল রানা। রিতার মাথাটা আলতো করে নামিয়ে দিয়ে উঠে বসল। রানার জামাকাপড়ের পাশেই হোলস্টারে লোডেড ওয়াল-থার পি, পি। হাত বাড়াতে গিয়েও থমকে গেল রানা। দুলে উঠল গাড়ীটা। ঝট করে পিছু ফিরল।

একগাল হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাঞ্জা। পাশেই বেলাল। দুজনের হাতে দুটো ল্যুগার, নিষ্পলক চেয়ে

রয়েছে রানার বুকের দিকে। ধীরে ধীরে মাথার উপর হাত তুলল রানা। এবার দুজনের ফাঁক গলে সামনে এসে দাঁড়াল আহমদ শফিক। ডান হাতটা স্লিং-এ ঝোলান। বামহাতে আংগুল বুলাচ্ছে দাড়িতে। মুখে অনাবিল হাসি।

আপনাদের সুখ-নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটানর জন্যে আমি সত্যিই আন্তরিক দুঃখিত, জনাব।'

পনের

তাজ্জব হয়ে গেল এস. পি. জহুরুল হক।

'বলেন কি সাহেব! একা যাবেন কেন? পুলিশ ফোর্স নিয়ে যান।'

'রিতাকে জ্যান্ত পাচ্ছেন না তাহলে।'

'সেও তো কথা···কিন্তু আপনি একা যাবেন, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই, নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থাই নেয়া যাবে না, এটা কেমন কথা হল? ওদের হুমকির কাছে নতি স্বীকার করে নিতে হবে আমাদের? তাছাড়া প্লেটগুলো ওদের হাতে পড়লে দেশের ভবিষ্যৎটার কথা একটু ভেবে দেখুন।'

'সবই ভেবে দেখেছি। এখন এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

'আমার কি করতে হবে তাই বলুন।'

গানের খাতাটা বের করল রানা। বলল, 'আমি ওদের বলেছিলাম প্লেটদুটো আপনার কাছে দিয়েছি। সেইজন্যেই আমার এখানে আসা। প্লেট না পেলে ওরা রিতাকে হত্যা করবে, কাজেই আমি ছলে-বলে-কৌশলে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি ওদুটো। এখান থেকে আমি বেরিয়ে যাবার পর আমার বিরুদ্ধে কিছুটা পুলিশী তৎপরতা দরকার। বুঝতে পেরেছেন? কিন্তু দেখবেন, আমাকে যেন আবার ফলো না করা হয়।'

'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনার প্ল্যানটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'প্ল্যান এখনো পুরোপুরি গুছিয়ে উঠবার সময় পাইনি। তবে এটা ঠিক, সহজে এগুলো তুলে দেব না ওদের হাতে।'

চা এল। সেই সাথে খুলনার নামজাদা কনফেকশনারীর কিছু বিস্কিট। গানের খাতাটার দিকে ইঙ্গিত করল জহুরুল হক।

'এর মধ্যেই আছে বুঝি প্লেটগুলো?'

'দেখা যাক, সত্যিই আছে কিনা। আছে বলেই আমার অনুমান। পরীক্ষা করে দেখার সময় পাইনি। হোস্টেল থেকে এটা উদ্ধার করে সোজা গিয়েছি শাহীন হোটেলে, আমার কামরার বাথরুমে একটা পয়েন্ট টু ফাইভ পিস্তল লুকোন ছিল, সেটা নিয়ে চলে এসেছি আপনার এখানে। এখন

বেলা সাড়ে তিনটে। সময় নেই হাতে। সন্ধ্যের আগে কাজ সারার চেষ্টা করতে হবে। আপনি এটা দেখুন, আমি পিস্তলটা পরীক্ষা করে দেখি প্রয়োজনের সময় আটকে বসবে কিনা।'

গানের খাতাটা বাড়িয়ে দিল রানা এস, পির দিকে। সাগ্রহে সেটা নিয়ে কাভারের গায়ে গোপন পকেট খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে। রানা দ্রুতহাতে পরীক্ষা করল বেরেটা পিস্তলটা। ওয়ালথার পি. পি. টার জন্যে দুঃখ হল রানার। কেড়ে রেখে দিয়েছে ওটা বেলাল। কিন্তু এটাতেও কাজ চলবে। সাতটা গুলি জায়গা মত পৌঁছলেই হল, পিস্তলটা জার্মেনীর তৈরি না ইটালীর তৈরি দেখার সময় এটা নয়। মোটামুটি সন্তুষ্ট হল রানা তোতলা ইজ্জত আলীর উপর—পিস্তলটাকে যত্নের ত্রুটি করেনি লোকটা। ঝকঝকে পরিষ্কার, প্রয়োজনীয় সমস্ত জায়গায় তেল দেয়া হয়েছে। বার কয়েক দেয়ালে টাঙানো বাঘের চোখের দিকে তাক করল রানা পিস্তলটা, কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করল না বাঘটা, বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে রইল রানার দিকে কাচের চোখ মেলে।

'কোথায় প্লেট?' বলল জহুরুল হক। 'দুটো চিঠি দেখতে পাচ্ছি শুধু।'

হাত বাড়িয়ে চিঠিদুটো নিল রানা। একটা শিবানীকে, আরেকটা রিতাকে লেখা।

শিবানী,

তোমাকে শেষ সুযোগ দিচ্ছি।

যদি বাঁচতে চাও, যদি আর সবার সাথে ধরা পড়ে জেল খাটতে না চাও, তাহলে প্লেট দুটো তুলে দিয়ো পত্রবাহকের হাতে।

যদি বারণ করা সত্ত্বেও ওদুটো রাজেশের হাতে তুলে দিয়ে থাকো, তোমার পাপের ফল তুমি ভোগ করবে।

আরো একটা কথা···যাবার আগে
তোমাকে ক্ষমা করে দিয়ে গেলাম।

দেবাশীষ।

রিতা,

তোকে কি বলে সান্ত্বনা দেব বোন?

আমি তো জানি দাদা ছাড়া আর কিচ্ছু বুঝিস না তুই। জীবনটা অসহ্য হয়ে গিয়েছিল রিতা। খুব কষ্ট হচ্ছিল। তাই চলে গেলাম।

যাবার আগে জননী জন্মভূমির জন্যে কিছু করে গেলাম, যদি পারিস, এটাকেই সান্ত্বনা হিসেবে গ্রহণ করিস। ওপার থেকেও চিরকাল আমার আশীর্বাদ ঝরবে তোর মাথার ওপর। দেখিস, কোনদিন কোন অমংগল হবে না তোর।

লক্ষ্মী বোন, বেশি কাঁদিস না।

তোর দাদা।

ছুটল রানা খান জাহান আলী রোড ধরে দত্তবাড়ীর দিকে।

মরিস মাইনর দেখে চমকে গিয়েছিল শিবানী, রানাকে দেখে একটু আশ্বস্ত হল। চিঠিটা পকেট থেকে বের করে দিল রানা। পড়তে পড়তে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল শিবানীর চোখ থেকে কাগজের উপর। চোখ বুঁজে বসে রইল সে কয়েক সেকেণ্ড, তারপর কোন কথা না বলে উঠে চলে গেল বাড়ীর ভিতর। কোন চপলতা নেই চলার ভংগিতে।

শান্ত, স্নিগ্ধ, সম্পূর্ণ অন্য মানুষ মনে হচ্ছে শিবানীকে আজ।

ফিরে এল ধীর পায়ে। হাতে একটা ছোট প্যাকেট। কোন কথা না বলে রানার হাতে তুলে দিল সেটা। রানা লক্ষ্য করল, নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে শিবানী, কিন্তু চোখের জল বাধা মানছে না, গড়িয়ে চলেছে ফোঁটার পর ফোঁটা।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'কখন এসেছে এটা?'

'আজ সকালে।'

'রাজেশ এসেছিল?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল শিবানী। বলল, 'খানিক আগে।'

'গুড।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'আপনার সুমতি হয়েছে দেখে সুখী হলাম। আপনাকে নিয়ে যেন কোন রকম

টানাহ্যাঁচড়া না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখব আমি। চলি।'

'শুনুন।' পিছু ডাকল শিবানী। রানা ফিরে চাইতেই বলল, 'কাল ওর বোনকে নিয়ে যেসব কথা বলেছিলাম···'

'সেগুলো সত্য নয়। আমি জানি।'

বেরিয়ে এল রানা। অন্য ড্রাইভারদের বিরক্তি এবং পথচারীদের ভীতি উৎপাদন করতে করতে ছুটল রানা যশোর রোড ধরে। ছোট্ট মরিস মাইনরের উপর মেজর কাজের ভার দিয়ে ওটার জান বের করে দেয়ার জোগাড় করল। পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছল যশোর। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে যখন নিশ্চিন্ত হল যে অনুসরণ করা হচ্ছে না, তখন সোজা গিয়ে হাজির হল পুরোন বন্ধু কর্ণেল আলতাফের কোয়ার্টারে।

রানাকে দেখেই হৈ-চৈ করে উঠল আলতাফের বাচ্চা দুটো। মেয়েটা সাত বছরের, ছেলেটা চার। চিৎকার করে ডাকাডাকি শুরু করল মাকে। 'আম্মা, ক্যাডবেরি চাচা এসেছে। কী মজা, কী মজা! শীগগির এসো আম্মি! দেখে যাও!'

হাসিমুখে এসে দাঁড়াল আলেয়া। কিন্তু রানাকে দেখেই আঁৎকে উঠল।

'একি হাল হয়েছে আপনার। কি ব্যাপার?'

'সব বলব পরে। এখন জলদি একটু আলেয়ার পার্ট করুন দেখি? একটু অভিনয় করতে হবে। টেলিফোনটা কোথায়?'

দুই বাচ্চার হাতে দুটো চারকোণা বাক্স ধরিয়ে দিল রানা। একটার মধ্যে বড়সড় একখানা পুতুল—চাবী দিলে হাত পা নেড়ে কাঁদে, অন্যটায় কিম্ভূতকিমাকার একটা লোমওয়ালা শিম্পাঞ্জী—চাবী দিলে লাফিয়ে ডিগবাজী খেয়ে নানান রকম ভংগি করে এক বিতিকিচ্ছিরী কাণ্ড বাধিয়ে বসে, যেন খুশির সীমা নাই।

'যাও ত চাচু, এখন ভাগো। ঐ ঘরে গিয়ে খেলগে তোমরা।'

'আর চকলেট?' সরাসরি প্রশ্ন করল ছোটটা। বড়টা গুঁতো দিল ওর পেটে শাসনের ভংগিতে।

ভয়ানক লজ্জা পাওয়ার ভান করল রানা। বলল, 'ওহ্-হো, ভুলে গেছি চাচু। এর পরের বার এলে নিয়ে আসব। আর ভুল হবে না।'

'তুমি ত আসোই না। অনেকদিন পরে এসেছিলে, আর আস না।'

'যদি আসতে না পারি, পাঠিয়ে দেব। তাহলে হবে?'

'আচ্ছা।' রাজি হয়ে চলে গেল দুজন।

পাশের ঘর থেকে লম্বা তার জোড়া টেলিফোনটা নিয়ে এল আলেয়া। রানা জিজ্ঞেস করল, 'আলতাফ কোথায়?'

'হাসপাতালে। রুগী দেখে বেড়াচ্ছে। খবর দিলেই এক্ষুণি ছুটে আসবে। ডাকব?'

'না। তাড়াহুড়ো আছে আমার। আপনি বসুন,

আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি কি করতে হবে।'

সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিল রানা। আর কিছুই না, টেলিফোন অপারেটারের অভিনয় করতে হবে আলেয়াকে। ঝিনাইদহের একটা নাম্বারে রিং করে বলতে হবে খুলনা থেকে কল এসেছে, আহমদ শফিক সাহেবকে চায় মাসুদ রানা।

কাচের জানালা দিয়ে বিকেলের পড়ন্ত রোদ দেখছে রানা। অপেক্ষা করছে।

রানা যা আশা করেছিল, ঠিক তাই। ঐ নাম্বারে পাওয়া গেল না আহমদ শফিককে। কিন্তু কোন্ নাম্বারে পাওয়া যাবে তা জানা গেল। আবার খানিক গোলমাল, হ্যালো, হ্যালো, কি বলছেন শোনা যাচ্ছে না ঠিকমত, হ্যাঁ, আহমদ শফিক সাহেবকে দিন, খুলনার কল, ইত্যাদি, ইত্যাদির পর পাওয়া গেল আহমদ শফিককে।

'হ্যালো, কে আহমদ শফিক সাহেব? খুলনা থেকে বলছি, লাইনে থাকুন, আমি কানেকশন দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুলনা থেকে। মাসুদ রানা কথা বলতে চান। নিন কথা বলুন।'

রিসিভারের গায়ে নখ দিয়ে খড়মড় আওয়াজ করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল আলেয়া, মুখে সাফল্যের হাসি। মাথা নেড়ে নীরবে প্রশংসা করল রানা ওর অপূর্ব অভিনয়ের জন্যে, হাত বাড়িয়ে নিল রিসিভারটা।

'হ্যালো? আহমদ শফিক বলছেন?'

'জোরে বলুন, শোনা যাচ্ছে না।' আহমদ শফিকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'মাসুদ রানা বলছি, খুলনা থেকে...' গলার স্বর চড়িয়ে বলল রানা।

'বলুন। কামিয়াব হয়েছেন?'

'হ্যাঁ। অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, কিন্তু ওদুটো এখন আমার কাছে।'

'কোন রকম গোলমাল?'

'হয়েছে, কিন্তু সামান্য। আপনার দুশ্চিন্তার কিছু নেই। রিতাকে দিন টেলিফোনটা।'

'কি ধরনের গোলমাল?'

'কেন বাজে বকছেন?' রেগে ওঠার ভান করল রানা। 'ওরা ভাত বেড়ে প্লেটদুটো তুলে দেবে আমার হাতে, এরকম আন্দাজ করেছিলেন নাকি? জোর করে ছিনিয়ে আনতে হয়েছে আমার। এতক্ষণে ওয়ারেণ্ট বেরিয়ে গেছে আমার নামে। রিতাকে দিন টেলিফোন।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

তিন সেকেণ্ড পর রিতার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'রানা! প্লিজ, এই কাজটা করো না। আমার জন্যে...'

'তুমি ঠিক আছো ত রিতা? কোন অত্যাচার হয়নি তোমার ওপর?'

'না, তা হয়নি। কিন্তু আমার কথা ভেব না, আমার যা হয় হোক, কিছুতেই এ কাজ কর না তুমি। প্লিজ!'

'যা করার করে ফেলেছি। এখন আর ফেরার রাস্তা নেই রিতা। শুয়োরের বাচ্চাটাকে দাও।'

'দেখলেন ত? আমার কথা আমি ঠিকই রেখেছি। আপনার জানানার গায়ে হাত দেয়নি কেউ। এবার মন দিয়ে শুনুন। সোজা ঝিনাইদহে এসে...'

'ক্ষেপেছেন নাকি?' বলল রানা। 'বোকা পেয়েছেন আমাকে? আপনার খপ্পরের ভেতর ঢুকছি না আমি কিছুতেই। অন্য কোথাও দেখা হবে আমাদের, ঝিনাইদহে নয়।'

আহমদ শফিকের বিনীত নম্র কণ্ঠস্বর কঠোর হয়ে গেল মুহূর্তে। 'আপনার পছন্দসই জায়গায় আমাদেরকে যেতে হবে, এই বলতে চাইছেন?'

'আজ্ঞে না। নিউট্রাল গ্রাউণ্ড খুঁজে বের করতে হবে। আমি পুলিশের সাহায্য নেব কি নেব না আপনার জানার কথা নয়। আপনার সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। অথচ নিরস্ত্র অবস্থায় প্লেটসহ আপনার গর্তে ঢুকে পড়লে আমার পক্ষে আর বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে কিনা, সে বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই চালমাত অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটি মাত্র উপায় দেখতে পাচ্ছি। ঝিনাইদহ ছাড়া যে কোন একটা জায়গার নাম বলুন, আমি পৌঁছে যাব সেখানে। কিন্তু এমন একটা জায়গার নাম বলবেন যেখানে আমরা দুই প্রান্ত থেকে প্রায় কাছাকাছি সময়ে পৌঁছতে পারি। সন্ধ্যের

আগেই সারতে হবে কাজটা।'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল আহমদ শফিক। হাঁ করে চেয়ে রয়েছে আলেয়া রানার মুখের দিকে। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে সে। ভয়ংকর কিছু ঘটতে চলেছে কিছুক্ষণের ভিতর।

আহমদ শফিকের গলা ভেসে এল অপর প্রান্ত থেকে। 'চৌগাছা চেনেন?'

নিষ্ঠুর একটুকরো হাসি ফুটে উঠল রানার মুখে। বলল, 'ভাল করে চিনি না। যশোর থেকে জীবননগর যাবার পথে পড়বে তো? কিন্তু সে ত অনেক দূর হবে এখান থেকে।'

'হ্যাঁ। একটু দূরই হবে। চৌগাছা ছাড়িয়ে আরো মাইল তিনেক চলে যাবেন রাস্তা ধরে। দুইপাশে জংগল। ডান ধারে একটা কাঁচা রাস্তা পড়বে। সেই রাস্তা ধরে চলে আসবেন জংগলের ভেতর। মাইল খানেক আসার পর একটা পোড়োবাড়ী দেখতে পাবেন। কোন এক জমিদারের বাগান বাড়ী ছিল একসময়। এখন কেউ থাকে না। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে তিনবার তিনবার ছ'বার হর্ণ বাজাবেন। তারপর প্লেটসহ নেমে আসবেন গাড়ী থেকে। নিরস্ত্র থাকবেন। দয়া করে ভুলে যাবেন না, কোন রকম চালাকীর চেষ্টা করলেই নির্মম ভাবে হত্যা করা হবে রিতা দত্তকে। বুঝতে পেরেছেন?'

'পরিষ্কার। ঠিক আছে, আসছি আমি। খুলনা

শিপইয়ার্ড থেকে কথা বলছি আমি এখন। কাজেই সময় লাগবে। যত তাড়াতাড়ি পারি আসার চেষ্টা করব, দেরি হলে আবার ভড়কে যাবেন না। কেউ অনুসরণ করছে কিনা ভালমত দেখেশুনে আসতে হবে ত, একটু দেরি হতে পারে।'

'যুক্তিসংগত কথা। ধৈর্য ধরার চেষ্টা করব। যতক্ষণ সম্ভব।'

'মনে রাখবেন, রিতার কিছু হলে প্লেটের নাগাল পাবেন না আপনি কোনদিন।' হঠাৎ স্বর পরিবর্তন করে বলল, 'রিতাকে দিন আবার।'

তুই সেকেণ্ড পর রিতার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'কাজটা ঠিক হচ্ছে না রানা।'

'শোন, রিতা। ভয় পেয়ো না। ঐ প্লেটছুটোর চেয়ে তোমার প্রাণের মূল্য অনেক বেশী। আমার একটু দেরী হতে পারে, খুলনা থেকে চৌগাছা পৌঁছতে সময় লাগবে। ঘাবড়ে যেয়ো না। ওরা যা বলে করতে হবে তোমাকে। করবে। ওদের ভাল করেই জানা আছে, তোমার কোন ক্ষতি হলে প্লেটহুটো পাবে না ওরা কোনদিন। কাজেই তোমার ভয় নেই। বুঝেছ?'

'নিজের জন্যে ততটা নয়, তোমার জন্যে ভয় লাগছে আমার। এই কাজটা কেন করতে গেলে তুমি রানা?'

'উপায় ছিল না এছাড়া। রাখলাম।'

ফোন ছেড়ে দিল রানা। খপ করে ওর হাত ধরল আলেয়া।

'কি ব্যাপার মাসুদ সাহেব? খুবই সিরিয়াস মনে হচ্ছে? ডাক্তারকে ডাকব?'

'ওকে ডেকে লাভ কি?'

'আর্মি নিয়ে যান।'

'তাহলে শুধু শুধু মারা যাবে একটা নিরপরাধ মেয়ে।'

'একা গেলে তো আপনাকেও মেরে ফেলবে।' রিসিভার কানে তুলে নিল আলেয়া। 'অন্ততঃ ওর পরামর্শটা নেয়া উচিত। আমি ডাকছি।'

'না।' বাধা দিল রানা। 'আলতাফকে সব কথা বুঝিয়ে ওকে সাহায্য করা থেকে বিরত রাখতে হলে ঝাড়া একটি ঘণ্টা সময়ের দরকার। অত সময় হাতে নেই, আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন। চৌগাছার আশে-পাশে খাকি পোশাক দেখলেই জবাই করবে ওরা রিতাকে, আমার সাথে আর পরামর্শের প্রয়োজন বোধ করবে না। আমি বরং একটা চিঠি দিচ্ছি—এটা দেবেন আতাফকে।' লিখল খশখশ করে। চিঠিটা আলেয়ার হাতে দিয়েই উঠে দাঁড়াল রানা। 'আপনার সাহায্যের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলি এখন।'

'ব্যাপারটা কি, তাই ত বললেন না। কেন ওরা মারবে রিতাকে, কিসের প্লেট চুরি করে নিয়ে যাচ্ছেন…'

'সব বলব পরে। যদি বেঁচে থাকি, ফিরে এসে

গোড়া থেকে বলব গল্পটা রান্নাঘরে বসে। আপনি বরিয়ানী রাঁধবেন, আমি পেঁয়াজ কেটে দেব। চলি এখন, দেখা হবে।'

দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এল রানা। ছুটল চৌগাছার রাস্তায়। বিশ মিনিটে পার হল বিশ মাইল পথ। ডান ধারের কাঁচা রাস্তাটায় ঢুকতে গিয়েও ব্রেক কষল। চাকার দাগ দেখতে পাবে পরবর্তী গাড়ীর আরোহীরা। আবার কিছুদুর পিছিয়ে গিয়ে বামধারের জংগলের ভিতর লুকিয়ে রাখল রানা মরিস মাইনরটা। তারপর পায়ে হেঁটে চলল বাগান বাড়ীর দিকে। আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে মাইলখানেক পুবে আসতেই দেখতে পেল দালানটা। দোতালা। চারিপাশে প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সামনে কাঠের গেট। তালা মারা।

চমৎকার বাগান বাড়ী ছিল এক সময় এটা। দেয়াল টপকে ভিতরে চলে এল রানা। প্রকাণ্ড একটা দীঘির পাড়ে দালানটা। দেয়ালের এপাশেও খানিকটা জংগল রেখে দেয়া হয়েছে। বাকিটা পরিষ্কার করে সুন্দর একটা ফুলের বাগান করা হয়েছিল একসময়, এখন ঝোপঝাড় ভর্তি জংগল হয়ে গেছে সবটাই।

সাবধানে এগোল রানা। পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে হাতে। কুঁজো হয়ে এমন ভাবে এগোচ্ছে, যেন হঠাৎ যদি ভয় পেয়ে বাড়ীটা দৌড় দেয়, ও-ও উল্টো দিকে দৌড়ে দেয়াল টপকে ভাগতে পারে। কিছুদুর এগোচ্ছে, থামছে, লক্ষ্য করছে চারিপাশ, আবার এগোচ্ছে।

সব কটা দরজা জানালা বন্ধ। পুরো বাড়ীটা বার দুয়েক চক্কোর দিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হল রানা। লোকজনের কোন সাড়া নেই। সিঁড়ির উপর ধুলো আর শুকনো পাতা জমে আছে। অন্ততঃ মাস খানেক এখানে কোন মানুষের পদার্পণ হয়নি সহজেই বোঝা যাচ্ছে। একে একে বাড়ীর চারিপাশের জানালাগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করল রানা। সব জানালা ভিতর থেকে বন্ধ। সপ্তম জানালাটাকে একটু নরম পেয়ে ওটার উপরই জোর খাটানর সিদ্ধান্ত নিল সে। বৃষ্টির পানিতে বছরের পর বছর ভিজে পচে এসেছে কাঠ। মিনিট পাঁচেক টানা হেঁচড়ার পর খুলে গেল। ঢুকে পড়ল রানা।

ভিতরটায় ভ্যাপসা একটা গন্ধ। অন্ধকার। নিঃশব্দ।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল রানা দুই মিনিট। উৎকর্ণ হয়ে শুনবার চেষ্টা করল। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস আর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক ছাড়া আর কিছুই কানে এল না ওর। নিঃশব্দ পায়ে একতালার সব কটা ঘর ঘুরে দেখল রানা। অসংখ্য ইঁদুর আর আরশোলা ছাড়া আর কোন প্রাণী নেই। বৈঠকখানাটাই পছন্দ হল। যতদূর সম্ভব এই ঘরেই বসবে আহমদ শফিক। আবছা আলোয় পরীক্ষা করল রানা ঘরটা। দরজা জানালা খোলা অবস্থায় কেমন দেখাবে ঘরটা কল্পনা করে নিল। ঠিক কোনখানটায় পিস্তল হাতে দাঁড়ালে সারাটা ঘর আয়ত্তে রাখা যাবে বের করল হিসেব করে।

কয়েকটা গদি আঁটা পুরোন দিনের চেয়ার রয়েছে ঘরের ভিতর একটা সূক্ষ্ম কারুকাজ করা কাঠের তিন পায়া টেবিলকে ঘিরে। দেয়ালে টাঙান একটা উনিশ শতকের ঘড়ি, বারটা বেজে বন্ধ হয়ে রয়েছে—কবে ওটার বারটা বেজেছে কে জানে। পেণ্ডুলামের ডালাটা খুলে চাবী রাখার জায়গায় শুইয়ে দিল রানা কাগজে মোড়া স্টীল প্লেটের প্যাকেটটা। আবার লাগিয়ে দিল ডালা। এবার চলে এল সে দেয়ালের গায়ে বসান বুক কেসের সামনে। একটা তাকে শুধু কয়েকটা বই আছে বাকী তাকগুলো খালি। বইগুলো এগিয়ে আনল রানা দুই ইঞ্চি, তারপর ওগুলোর পিছনে রেখে দিল পিস্তলটা। সড়সড় করে পালাল একটা বড়সড় মাকড়সা।

ঘড়ি দেখল রানা। বিকেল পাঁচটা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবে ওরা। আবার একবার চারিপাশে চোখ বুলাল সে। এঘরে মোট তিনটে দরজা। একটা বাইরের থেকে ঢোকার জন্যে, অন্য দুটোর একটা পাশের ঘরে যাবার, অপরটা বাথরুমের। দরজাগুলো পরীক্ষা করল রানা কোনকিছু স্পর্শ না করে। পাশের ঘরটাও দেখল। তারপর যে পথে ঢুকেছিল সে পথেই বেরিয়ে এল বাইরে।

বাইরের গেট থেকে ঠিক বিশ হাত দূরে জংগলের ভিতর একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল রানা। সিগারেটের তেষ্টা পেয়েছে ভয়ানক, কিন্তু ধরাতে সাহস পাচ্ছে না। চুপচাপ বসে বসে চারিপাশের শব্দের ভিতর

ডুবে গেল সে। কাছাকাছিই পাল্লা দিয়ে ডাকছে দুটো ঝিঁঝি পোকা, দূরে কোন আমের ডালে ডাকছে পিউকাঁহা। একটা ভ্রমর বোঁ বোঁ শব্দ তুলে আশেপাশের কিছু বন্য ফুলের মধু পান করল, তারপর চলে গেল নতুন ফুলের সন্ধানে। বাতাসে পাতার মৃদু মর্মর। হঠাৎ চিঁহিঁ করে চৈত্রের আকাশ চিরে দিচ্ছে অলস চিল, পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে পড়ন্ত রোদে ডানা মেলে। কেমন একটা বুনো গন্ধ। বিকেল। যথেষ্ট আলো আছে এখনো। কিন্তু মশাগুলো দিন রাত মানে না, ইতিমধ্যেই পোয়াটেক রক্ত ধসিয়ে দিয়েছে রানার শরীর থেকে। কানের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে পিঙ্‌ঙ্‌ঙ্‌ শব্দ তুলে, কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে আসছে।

বসে বসে অস্থির হয়ে উঠল রানা। একটা কাঠ-ঠোকরা আধমিনিট অন্তর অন্তর কট্-কট্-কট্ কট্ করে ঠুকরে চলেছে কাঠ। এত তাড়াতাড়ি কি করে ঠোকরায় তাই নিয়ে মাথা ঘামাল সে কিছুক্ষণ। একটা গুইশাপকে লক্ষ্য করলো যতদুর পর্যন্ত দেখা যায়, ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর আবার ফিরল রাস্তার দিকে। নাহ্, ব্যাটারা টের পেয়ে গেল? অন্য কোন মতলব নেই ত?

রানা যখন ভাবছে উঠে পড়বে কিনা, ঠিক এমনি সময়ে একটা ইঞ্জিনের মৃদু গর্জন শোনা গেল, কয়েক সেকেণ্ড পরেই পেট্রলের গন্ধ এল নাকে। সাঁ করে গেটের সামনে এসে দাঁড়াল একটা ওপেল। দুজন নামল পিস্তল হাতে। গাড়ী চালাচ্ছে বেলাল। একজন পিস্তলধারী অপরিচিত,

অপরজন জামশেদ। তালা খুলে গেটটা হাঁ করে দিল জামশেদ, গাড়ী চলে গেল ভিতরে। এই দুজন গাড়ীতে উঠল না। প্রথমে চারিপাশে ঘুরে পরীক্ষা করল বাড়ীটা বাইরে থেকে। তারপর দরজার তালা খুলে ঢুকে পড়ল বাড়ীর ভিতর। মিনিট পাঁচেক পর বাইরে এসে কি যেন বলল জামশেদ বেলালকে, বেরিয়ে গেল গাড়ীটা গেট দিয়ে।

বসে রইল রানা। বাড়ীর চারিপাশে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে ঘুরছে জামশেদ পিস্তল হাতে। অপর জন চলে গেছে বাড়ীর ভিতর। একটু পরেই ড্রয়িংরুমের জানালাগুলোকে খুলে যেতে দেখে খুশি হল রানা, কিন্তু সেই সাথে আশংকাও দেখা দিল মনে—ঘরটা ঝেড়ে মুছে তৈরি করা হচ্ছে আজকের বৈঠকের জন্যে, পিস্তলটা আবিষ্কার করে বসবে না ত ব্যাটা আবার ?

বিশ মিনিট পর ফিরে এল ওপেল, ওটার পিছু পিছু এল একটা ল্যাণ্ড রোভার। ওপেলের পিছনের সীটে বসে আছে রিতা আর আহমদ শফিক। গেটের কাছে থেমে দাঁড়াল গাড়ীটা, এগিয়ে এল জামশেদ। নীচু গলায় কি একটা নির্দেশ দিল আহমদ শফিক বাম হাত নেড়ে। মাথা নেড়ে জামশেদ সায় দিতেই রওনা হল গাড়ী, সোজা গিয়ে দাঁড়াল গাড়ী বারান্দায়। চট করে নেমে দরজা খুলে দিল বেলাল। নামল রিতা আর আহমদ শফিক, চলে গেল বাড়ীর ভিতর।

ল্যাণ্ড রোভারটা গেট থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে নামিয়ে

দিল দুজনকে। স্টেন হাতে রাস্তার দুপাশে জংগলের আড়ালে লুকিয়ে গেল দুজন। এগিয়ে এল এবার গাড়ীটা। চালাচ্ছে পাঞ্জা। ঢুকে গেল গেট দিয়ে। গাড়ীটা গেটের দিকে মুখ করে ঘুরিয়ে রেখে নেমে এল গাড়ী থেকে। জামশেদকে কি যেন বলল পাঞ্জা, মুখ ভংগি করে কিছু একটা ইংগিত করল, হেসে গড়িয়ে পড়ল জামশেদ। গেটটা বন্ধ করল দুজন মিলে। গেটের দুপাশে দুজন। একটা দুটো কথা বলে চলে গেল পাঞ্জা ড্রয়িংরুমের দিকে, জামশেদ লুকিয়ে পড়ল রাস্তার পাশের একটা ঘন ঝোপের আড়ালে। মনে মনে হিসেব করল রানা। আহমদ শফিককে বাদ দিলেও আরো ছয়জন। ছয়জন সশস্ত্র লোককে সামলান সহজ কথা নয়। বিশেষ করে যখন প্রস্তুত রয়েছে ওরা গোলমালের জন্যে। এদের প্রস্তুতির নমুনা দেখে বেশ খানিকটা দমেই গেল সে। আরো বিশ মিনিট অপেক্ষা করবার পরেও যখন নতুন কিছু ঘটল না, তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল। সাঁঝ হয়ে আসছে। বড় রাস্তায় পৌঁছবার শর্টকাট পথটা মনে মনে ঠিক করে নিয়ে অতি সন্তর্পণে এগোল সেদিকে।

আধঘন্টা পর আবার এসে হাজির হল মাসুদ রানা। মরিস মাইনরে করে। লুকান লোকগুলোকে না দেখার ভান করতে রীতিমত অসুবিধে বোধ করল সে। দেখব না মনে করেও আড়চোখে একজনের পায়ের কিছুটা অংশ দেখে ফেলল। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তিনবার

হর্ণ বাজাল রানা, খানিক থেমে আবার তিনবার।

একটা ফড়িং ঢুকে পড়েছে গাড়ীর ভিতর, উইণ্ড স্ক্রীণ ভেদ করে বেরোবার জন্যে ফড়ফড় করছে। আলতো করে ধরে ওটাকে বাইরে ছেড়ে দিল রানা। ছাড়া পেয়েই নাচতে নাচতে চলে গেল ওটা জামশেদ যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল সেদিকে। দুলছে ঝোপটা। অপেক্ষা করছে রানা।

'মাথার ওপর হাত তুলে নেমে এসো।' কানের পাশ থেকে প্রায় ফিসফিস করে বলল জামশেদ।

নেমে এল রানা। প্রথমেই সার্চ করা হল ওকে। কিছুই পাওয়া গেল না। পিস্তল দিয়ে পিঠে গুঁতো দিল জামশেদ। সামনে এগোতে বলছে।

গেট খুলে ভিতরে চলে এল রানা। বৈঠকখানার দরজাটা খোলা, ঢুকে পড়ল ভিতরে। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল জামশেদ।

অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করা হয়েছে ঘরটা। রিতা আর আহমদ শফিক বসে আছে দুটো চেয়ারে। টেবিলের উপর দুটো, আর বুক শেলফের একটা তাকের উপর দুটো মোমবাতি জ্বলছে। জানালার পাশে মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাঞ্জা, ওর হাতের পিস্তলটা সোজা রানার বুকের দিকে তাক করে ধরা। পাঞ্জার দৃষ্টিতে লকলক করছে প্রতিশোধের আগুন। পাশের ঘরে যাবার দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে বেলাল। হাতে পিস্তল। এই জায়গাটাই পছন্দ করেছিল রানা নিজের জন্যে। সবার অলক্ষ্যে রানার দৃষ্টিটা একবার দেয়াল ঘড়ি আর বইয়ের তাকের উপর দিয়ে ঘুরে এল। ওগুলো আছে কি নেই বোঝা গেল না।

'এ তুমি কি করলে রানা?' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল রিতা। 'কেন করতে গেলে···'

'যা ভাল বুঝেছি করেছি, রিতা। এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।' বলল রানা মৃদু কণ্ঠে। স্মিত হেসে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল।

'প্লেটগুলো কোথায়?' প্রশ্ন করল আহমদ শফিক। 'আনেননি ওগুলো?'

'ক্ষেপেছেন নাকি? আপনি আশা করেছিলেন ওগুলো নিয়ে হাজির হব আমি? গর্দভ ঠাউরেছেন আমাকে? প্যাকেটটা নিয়ে আসব আর আপনি আমাদের দুজনকেই খুন করে রেখে কেটে পড়বেন এখান থেকে, এই মতলব ছিল বুঝি আপনার? অত সহজ হবে না ব্যাপারটা জনাব।'

ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে আহমদ শফিক। প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'কোথায় প্লেটগুলো?'

'আছে। কাছাকাছিই কোথাও আছে। আমাদের নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা করছেন আগে বলুন, ব্যবস্থাটা আমার পছন্দ হলে বিশ মিনিটের মধ্যে পাবেন আপনি প্লেট।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখল আহমদ শফিক রানাকে। দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে হাসল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'এখনো আপনার দর-দস্তুর করবার ক্ষমতা আছে বলে মনে করেন? নেই। সত্যিই নেই। আপনার কাছে প্লেট থাকতে পারে, কিন্তু আমার হাতে রয়েছেন আপনি এবং রিতা দত্ত। আপনি সাহসী লোক সন্দেহ নেই, অনেক সহ্য ক্ষমতা আপনার, আমি জানি। কিন্তু রিতা? উনি কতটা সহ্য করতে পারবেন পাঞ্জাকে? ভেবে দেখেছেন? আপনি প্লেটগুলো আমার হাতে তুলে না দিলে লেলিয়ে দেব আমি পাঞ্জাকে।'

হেসে উঠল রানা। 'ওসব ভয় আমাকে দেখাবেন না মিস্টার কুইকযোট। আমি যতক্ষণ ছিলাম না ততক্ষণ সুযোগ ছিল, এখন আর রিতার গায়ে হাত দেয়ার সাধ্য নেই কারো। ভাল করেই জানেন আপনি, আমাকে খুন করার আগে কেউ ওর গায়ে হাত দিতে পারবে না। বেপরোয়া লোক আমি। আমাকে খুন করার পর রিতার কপালে যাই ঘটুক, কিছুই এসে যাবে না আমার। কিন্তু এর ফলে প্লেটগুলো চিরতরে হারাচ্ছেন আপনি। কাজেই ফালতু কথা বাদ দিন। কাজের কথায় আসুন। আমাদের নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা?' সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা। পাঞ্জা একটু নড়ে উঠতেই বলল, 'ভয় নেই বাবা, আমার কাছে অস্ত্র নেই। পরীক্ষা করা হয়েছে। সিগারেট ধরাচ্ছি একটা।'

দেয়ালের গায়ে বসান বুক শেলফের দিকে এগোল রানা। মোমের আগুনে সিগারেট ধরাবার ছলে একটু ঝুঁকে দেখল, যথাস্থানেই রয়েছে পিস্তলটা। জানালার দিকে এগিয়ে গেল রানা। 'আপনি ভেবে বের করুন, আমি একটু খোলা হাওয়া খাই।'

ভুরু কুঁচকে ভাবছে আহমদ শফিক। পাঞ্জাকে ইশারা করতেই সরে গেল সে জানালার ধার থেকে। খানিকক্ষণ ভেবে আহমদ শফিক বলল, 'আপনি কি ভাবছেন? বদলাবদলির ব্যাপারে আপনার কি পরামর্শ?'

'আমার পরামর্শ হচ্ছে আমাকে একটা পিস্তল দিন, সাথে একজন নিরস্ত্র লোক দিন, আর ঐ ল্যাণ্ড রোভারটা দিন—আমি দশ মিনিটের মধ্যে নিয়ে আসছি প্লেট। গেটের কাছে গাড়ী থামাব আমি, আপনার লোকের সিগন্যাল পেলেই আপনি ছেড়ে দেবেন রিতাকে। এই গাড়ী বারান্দা থেকে হেঁটে এগোতে থাকবে রিতা ল্যাণ্ড রোভারের দিকে। রিতা মাঝামাঝি পৌঁছলে আপনার লোক প্লেট নিয়ে রওনা হবে আপনাদের দিকে। দুজনই দুপক্ষের শুটিং রেঞ্জের মধ্যে থাকছে, কাজেই গোলাগুলি হলে দুই পক্ষেরই ক্ষতি। রিতা পৌঁছে গেলেই আমি রওনা হয়ে যাচ্ছি ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে, আপনারাও পেয়ে যাচ্ছেন আপনাদের এত সাধের প্লেট।' জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে কথা বলছিল রানা। হঠাৎ লক্ষ্য করল একটা ছায়া তুলে উঠল দীঘির পাড়ে। কুঁজো হয়ে ঝোপঝাড়ের

আড়ালে আড়ালে এগিয়ে আসছে একজন লোক। রানার চেহারা দেখে বোঝা গেল না, কিন্তু ভিতর ভিতর ভয়ানক বিচলিত হয়ে উঠল সে। আহমদ শফিকের দিকে ফিরল। ভুরু নাচিয়ে প্রশ্ন করল, 'কি? পছন্দ হল প্ল্যানটা? এর চেয়ে ভাল কিছু ত মাথায় খেলছে না আমার।' ধীর পায়ে এগিয়ে এসে বুক শেলফে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা।

'যদি রাজি না হই?'

'তাহলে এর চেয়ে ভাল কোন প্ল্যান বের করতে হবে চিন্তা করে। চেষ্টা করে দেখুন।

রানা কথা বলছে ঠিকই, কিন্তু ওর মনটা চলে গেছে অন্যখানে। মাথার মধ্যে চিন্তা চলেছে চন্দ্রযানের গতিতে। সময় উপস্থিত। একটু এদিক ওদিক হলেই গোলমাল হয়ে যাবে সব। হঠাৎ এক অনাহূতের আগমনে সমস্ত প্ল্যান আবার ঢেলে সাজাতে হচ্ছে ওকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিল রানা

'টাশ্‌শ্‌!' রাইফেলের আওয়াজ এলো বাইরে থেকে।

পরমুহূর্তে ভেসে এল পর পর তিনবার পিস্তলের গর্জন।

একসাথে অনেকগুলো ব্যাপার ঘটে গেল বৈঠকখানার ভিতর। চিৎকার করে কিছু বলল আহমদ শফিক, এক লাথি দিয়ে উল্টে দিল রানা ওর সামনের তিন-পায়া কাঠের টেবিলটা। হুড়মুড় করে পড়ে গেল আহমদ শফিক চেয়ারসহ। খপ করে ধরে ফেলল পাঙ্গা রিতার হাত। একটানে তুলে ধাক্কা দিল পাশের ঘরের দিকে। গোক্ষুরের

ছোবলের গতিতে বইয়ের ওপাশ থেকে বেরেটা বের করে ফেলল রানা। প্রথম গুলিটা ঢুকল বেলালের শ্বাস-নালীর ভিতর। দ্বিতীয় গুলিটা বেরোল বেলালের পিস্তল থেকে—ছাত থেকে একরাশ চুন শুরকি ঝরে পড়ল। তৃতীয় গুলির প্রয়োজন পড়ল না, রিতাকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল পাঞ্জার।

'পিস্তল ফেলে দাও পাঞ্জা! খবরদার! পিছনে সরে যাও।'

একটু ইতস্তত: করে পিছিয়ে গেল পাঞ্জা, ফেলে দিল পিস্তলটা হাত থেকে। টেবিলের নীচে থেকে বেরোবার চেষ্টা করছে আহমদ শফিক।

'রিতা! পাশের ঘরে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দাও। দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাক, নয়ত শুয়ে পড় মাটিতে। যাও! শীগগির!'

চট করে পাশের ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল রিতা। সংগে সংগে ঝটাং করে খুলে গেল সামনের দরজাটা। বিদ্যুৎবেগে ঘুরল রানা। দাঁড়িয়ে আছে জামশেদ পিস্তল। হাতে। ঘুরেই গুলি করল রানা। চমকে উঠল জামশেদ, বাঁকা হয়ে গেল শরীরটা সামনের দিকে, বিকৃত হয়ে গেছে চেহারাটা, লাল হয়ে উঠলো ফুটো হয়ে যাওয়া গেঞ্জিটা, বুকের কাছে। ঢলে পড়ে গেল বামপাশে। মৃত।

কিন্তু জামশেদকে সামলাতে গিয়ে অবস্থাটা আয়ত্তের বাইরে চলে গেল রানার। দুই সেকেণ্ডের সুযোগই পাঞ্জার

জন্যে যথেষ্ট। ঝট করে তুলে নিয়েছে সে পিস্তলটা, সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে রানার পিঠের উপর পিছন থেকে। কয়েক সেকেণ্ড ধস্তাধস্তি করল রানা, কিন্তু ছুটতে পারল না। প্রচণ্ড শক্তি পাঞ্জার গায়ে। এমনভাবে সাপটে ধরেছে যে একচুলও নড়াতে পারল না রানা ডানহাতটা। ধাক্কা দিয়ে রানার ভারসাম্য টলিয়ে দিয়েই ল্যাঙ মারল পাঞ্জা। পড়ে যাচ্ছে রানা, এমনি সময়ে হঠাৎ ছেড়ে দিল সে রানাকে। পরমুহূর্তে পিস্তলের বাটের প্রচণ্ড এক আঘাত পড়ল রানার মাথার পিছনে। সবকিছু আবছা হয়ে এল চোখের সামনে।

থমকে গেল সময়। গত কয়েকটা সেকেণ্ড মনে হচ্ছিল অত্যন্ত দ্রুত বইছে সময়, এত অল্প সময়ের মধ্যে এত ঘটনা ঘটে গেল যে ভাল মত ঠাহর করা যাচ্ছিল না সবকিছু—এবার ঢিলে হয়ে গেল আবার সময়ের গতি। হাত থেকে পিস্তলটা খসে গেল রানার, ছিটকে চলে গেল একটা চেয়ারের নীচে। হুড়মুড় করে পড়ল সে মেঝের উপর। তার উপর পড়ল পাঞ্জা। রানার বাম হাতটা বাঁকিয়ে পিছনে এনে বেকায়দা রকমের চাপ দিচ্ছে একহাতে, অপর হাতে পিস্তল ঠেসে ধরেছে মাথার পিছনে।

জখম হওয়া হাতটা বাঁচিয়ে বহু কষ্টে টেবিল সরিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ শফিক। বাম হাতে ছোট্ট পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে। হাঁপাচ্ছে উত্তেজনায়। মৃত সংগি দুজনকে দেখল। তাজা রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে ঘরের পানি বেরোবার ফোঁকড়ের দিকে। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে প্রস্তুত হল পিস্তল নিয়ে।

খোলা দরজা দিয়ে ঢুকল একজন। একহাতে পিস্তল, অপর হাতে গোপাল ভৌমিকের কলার। ছেঁচড়ে টেনে ঘরের ভিতর নিয়ে এল ওকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা ছিমছাম ভৌমিককে চিনবার উপায় নেই। মুখের এক অংশ সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছে চাপ চাপ রক্ত লেগে থাকায়, দুই চোখ বন্ধ, হাতদুটো ঝুলে আছে কাঁধ থেকে আলগা ভাবে। মনে হচ্ছে ষ্টীম রোলারের তলে পড়েছিল।

ঘরে ঢুকে চারিপাশে একবার চোখ বুলিয়েই অবস্থাটা বুঝে নিল আগন্তুক, জোরে একটা ধাক্কা দিল গোপাল ভৌমিককে চেয়ারের দিকে। হুড়মুড় করে পড়ল ভৌমিক উল্টান টেবিলের উপর, সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ল একটা চেয়ারের উপর, এবং পড়েই থাকল।

দুই পা এগিয়ে এসে লাথি মারল লোকটা রানার পাঁজরে।

'মেরো না ওকে। কথা আদায় করতে হবে ওর কাছ থেকে।' এগিয়ে এল আহমদ শফিক।

অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে রানা, পিঠের উপর বসে আছে পাঞ্জা, ব্যথায় বিকৃত ওর মুখ, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। সামনে এসে দাঁড়াল আহমদ শফিক।

'অতি চালাকী করতে গিয়েছিলেন জনাব মাসুদ রানা। আপনি আর আপনার দোসর। আগে থেকেই পিস্তল লুকিয়ে রেখেছিলেন এই ঘরে ঢুকে। আপনার কপাল খারাপ। পারলেন না শেষ পর্যন্ত। আমি জানি প্লেট

দুটোও আশেপাশেই কোথাও আছে। মেয়েটাকে রক্ষা করবার একটি মাত্র পথ খোলা আছে আপনার সামনে এখন। বলে ফেলুন। হাতে সময় নেই। গোলাগুলির শব্দ কতদূর পর্যন্ত শোনা গেছে, কেউ শুনতে পেয়েছে কিনা, কিছুই জানা নেই আমাদের। কাজেই আগামী পনের মিনিটের মধ্যে সরে পড়তে হবে আমাদের এখান থেকে। আপনাদের দুজনকে হত্যা করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই আমাদের, খুনের বদলা খুন নিতেই হবে আমাকে, কিন্তু ইচ্ছে করলে রিতা দত্তকে রক্ষা করতে পারেন পাঞ্জার হাত থেকে। বলে ফেলুন কোথায় আছে ওগুলো, নইলে আপনার হাত পা বেঁধে রেখে আপনারই চোখের সামনে বলাৎকার করা হবে ওর ওপর। আর যদি কোন গোলমাল না করে আমার কথামত কাজ করেন, তাহলে ওকে ছেড়ে দেব। শুধু তাই নয়, আপনার মৃত্যু যেন বিনা কষ্টের হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখব আমি। কি? কোন্‌টা চান?'

গোপাল ভৌমিকের দিকে চেয়ে উত্তর দিল রানা। 'আগে ছেড়ে দিন রিতাকে, তারপর বলব।'

চোখ বন্ধ করে মরার মত পড়ে আছে ভৌমিক। বেঁচে যে আছে তার একমাত্র প্রমাণ বুকটা ওঠা নামা করছে। অজ্ঞান না সজ্ঞান বোঝার উপায় নেই। বেয়াড়া ভংগিতে হেলে রয়েছে মাথাটা চেয়ারের হাতার উপর। মুখটা রানার দিকে ফেরান।

'খামোশ!' হঠাৎ ক্ষেপে উঠল আহমদ শফিক। 'যথেষ্ট

বেয়াদবী সহ্য করেছি। আর নয়। ছল চাতুরীর অন্ত নেই আপনার। এবার আমার কথাই থাকবে। কোন আপোষ নেই। আগে প্লেট হাতে আসবে আমার, তারপর ছাড়া পাবে মেয়েলোকটা। এক মিনিটের মধ্যে প্লেট কোথায় আছে না বললে আপনার হাত পা বেঁধে রেখে পাশের ঘরে ঢুকবে পাঞ্জা।'

অন্যমনস্কভাবে গোপাল ভৌমিকের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে রানা। রানার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করছে সে, ভাবছে আহমদ শফিকের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে কি না। ধীরে, খুব ধীরে একচিলতে পরিমাণ খুলল ভৌমিকের বাম চোখের পাতা। এক ইঞ্চির ছয়ভাগের একভাগ। সেই অবস্থায় মোলায়েম ভাবে চোখ টিপল সে রানার উদ্দেশ্যে। চোখ সরিয়ে নিল রানা। চাইল আহমদ শফিকের দিকে।

'এক মিনিট পার হয়ে গেছে,' বলল আহমদ শফিক।

'দেয়াল ঘড়িটার পেণ্ডুলামের ঘরে রেখেছি প্লেটদুটো।'

ঝট করে আহমদ শফিক, পাঞ্জা আর অপর লোকটির দৃষ্টি গেল দেয়ালে টাঙান বুড়ো ঘড়িটার দিকে। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল আহমদ শফিক। পিস্তলটা কোমরে গুজে নিল, তারপর একটানে ডালাটা খুলে প্যাকেটটা বের করে আনল। হাসি ফুটে উঠেছে ওর ঠোঁটে। জ্বালচে হাসি। বুক শেলফের কাছে সরে গেল সে, একটা তাকের উপর রেখে এক হাতে খোলার চেষ্টা করছে

প্যাকেটটা।

একটা প্লেট বেরিয়ে এল কয়েক পরতা কাগজের ভাঁজ খুলতেই, দ্বিতীয়টা বের করছে এবার আহমদ শফিক। হেসে উঠল জয়ের আনন্দে।

শত্রুপক্ষের দুজনেরই চোখ আঠার মত সেঁটে গিয়েছে আহমদ শফিকের হাতে। দেখার সুবিধের জন্যে একটু কাৎ হয়ে ডানদিকে ঝুঁকল পাঞ্জা। আহমদ শফিক সন্তুষ্ট চিত্তে বলল, 'যাক, অবশেষে। এত তকলিফের পর শেষ পর্যন্ত...'

'এইবার!' চিৎকার করে উঠল রানা। সেইসাথে ঝট করে পাশ ফিরল এবং ডান হাতটা চালাল পাঞ্জার কণ্ঠনালী লক্ষ্য করে। অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল পাঞ্জা, কিন্তু সেই অবস্থাতেও আশ্চর্যগতিতে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিল রানাকে। জায়গামত না পড়ে ঘাড়ের পাশে পড়ল আঘাতটা। সাথে সাথেই বুকের উপর এসে পড়ল রানার জোড়া পায়ের লাথি। ছিটকে গিয়ে আহমদ শফিকের গায়ের উপর পড়ল পাঞ্জা। ডিগবাজী খেয়ে উঠে দাঁড়াল রানা বেলালের হাত থেকে খসে পড়া রক্ত চটচটে পিস্তলটা নিয়ে।

ইতিমধ্যে তড়াক করে চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তলধারী লোকটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে ভৌমিক। গুলি করল লোকটা, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল গুলি, রানার একহাত তফাৎ দিয়ে গিয়ে দেয়ালের গায়ে লাগল।

সামলে নিয়েছে পাঞ্জা। চট করে প্লেটদুটো শেলফের উপর রেখে পিস্তলটা তুলে নিচ্ছে আহমদ শফিক।

রানার প্রথম গুলিটা বিঁধল গিয়ে পাঞ্জার পিস্তলধরা হাতে। আহত বাঘের মত লাফ দিল পাঞ্জা। পিস্তলটা ছিটকে চলে গেছে ঘরের কোণে। রানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে প্রকাণ্ড দৈত্যটা, পরোয়া নেই রানার হাতে ধরা পিস্তলটাকে। বামহাতে একটা চেয়ার তুলে নিয়েছে। কিন্তু এদিকে লক্ষ্য দেয়ার সময় নেই, এক ঝটকায় ভৌমিককে ফেলে দিয়েছে তৃতীয় লোকটা পিঠের উপর থেকে। মাটিতে পড়েই রানার হাত থেকে খসে পড়া বেরেটা তুলে নিল ভৌমিক। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি পিস্তলটা তাক করেছে ভৌমিকের বুকের দিকে। গুলি করল রানা। এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা। মরার পূর্ব মুহূর্তে ট্রিগারে চাপ দিয়েছিল লোকটা। বুম করে মাউযার থেকে গুলি ছুটে লাগল ভৌমিকের ডান কাঁধে। আবার ছুটে চলে গেল বেরেটা চেয়ারের নীচে।

দ্রুত নেমে আসছে পাঞ্জার হাতে ধরা চেয়ারটা। শেষ মুহূর্তে পাশ কাটাবার চেষ্টা করল রানা। পিঠের উপর দড়াম করে পড়ল চেয়ারের পায়া, ব্যথায় নীল হয়ে গেল রানার মুখ। দুই পা এগিয়ে গেল সে চেয়ারের ধাক্কায়।

পাঞ্জার আড়ালে ছিল বলে এতক্ষণ গুলি করতে পারছিল না আহমদ শফিক, রানাকে ফাঁকা পেয়েই গুলি

করল। জ্বলে উঠল রানার বাম বাহুটা কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত। লম্বালম্বি ভাবে কোয়ার্টার ইঞ্চি মাংস চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেছে গুলিটা। গুলি করল রানা, বুক শেলফের মোটা একটা পঞ্জিকার মেরুদণ্ড ভেদ করে ঢুকল গুলিটা। সরে গেছে আহমদ শফিক। মাথাটা ঘুরছে রানার। চেয়ারটা আবার মাথার উপর তুলে নিয়ে এগিয়ে আসছে পাঞ্জা। ওদিকে পাঞ্জার আড়ালে লুকিয়ে গুলি করবার সুযোগ খুঁজছে আহমদ শফিক।

সাঁই করে নেমে এল চেয়ারটা। ঝপ করে বসে পড়ল রানা, মাথাটা বামপাশে কাৎ করল একটু। কোথাও বাধা না পেয়ে রানার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল চেয়ারটা, ছুটে গেল পাঞ্জার হাত থেকে, সোজা গিয়ে, দড়াম করে পড়ল চেয়ারটা আহমদ শফিকের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ডান হাতের উপর। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল আহমদ শফিক, বাম হাতে ধরা পিস্তল থেকে গুলি বেরোল, কিন্তু রানার আশেপাশে দিয়েও গেল না সেটা। আবার গুলি করল রানা, তাড়াহুড়োয় আবার মিস করল। লাথি মেরে পিস্তলটা রানার হাত থেকে খসিয়ে দিয়ে খালি হাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল পাঞ্জা রানার উপর। বাম হাতে পেঁচিয়ে ধরেছে রানার গলা। ডান পায়ে ল্যাং মেরে মাটিতে ফেলার চেষ্টা করছে। ভুলেই গেছে সে রানার হাতে কিভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছিল আটরার আস্তানায়।

দ্রুত হাতে কয়েকটা দুর্বল নার্ভসেণ্টারে আঘাত করল

রানা। ব্যথা পেয়ে ক্রুদ্ধ গর্জন বেরোল পাঞ্জার মুখ থেকে। দুই সেকেণ্ড পরেই উঠে দাঁড়াল রানা, ওর পিঠের উপর উল্টো ভাবে ঝুলছে পাঞ্জা। প্রচণ্ড জোরে মাটিতে আছড়ে ফেলল রানা পাঞ্জার প্রকাণ্ড ধড়টা। পড়েই উঠে দাঁড়াল আবার পাঞ্জা। মাথাটা গুলিয়ে গেছে ওর। দিশেহারার মত আহমদ শফিকের দিকে যাচ্ছিল তেড়ে, মাঝপথে থেমে গিয়ে ফিরল রানার দিকে।

কিন্তু আর গুলি করছে না কেন আহমদ শফিক? ঝট করে মাথাটা একপাশে সরাল রানা। বোঁ করে ছোট্ট পিস্তলটা কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে। রানা বুঝল বিকল হয়ে গেছে পিস্তলটা। এদিক ওদিক পিস্তল খুঁজছে এখন আহমদ শফিক। এগিয়ে আসছে পাঞ্জা। ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা ভৌমিকের মাউযারের উপর। গুলি করল। পর পর তিনবার।

পাহাড়ের মত থমকে দাঁড়াল পাঞ্জা ঘরের মাঝখানে। কয়েক সেকেণ্ড দুলল অনিশ্চিত ভাবে। তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল গোপাল ভৌমিকের উপর। জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসতে যাচ্ছিল ভৌমিক, গায়ের উপর পাহাড় ধসে পড়ায় শুয়ে পড়ল আবার।

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পাগলের মত এদিক ওদিক হাতড়াচ্ছে আহমদ শফিক। পিস্তল খুঁজছে। মুচকি হাসল রানা। কোথায় কার পিস্তল পড়ছে লক্ষ্য রাখার

প্রয়োজন বোধ করেনি লোকটা, তাই এখন কাজের সময় কিছুই পাচ্ছে না হাতের কাছে। বুম করে গুলি বেরোল মাউযার থেকে। বামহাতের চারটে আংগুল গায়েব হয়ে গেল আহমদ শফিকের, পাঞ্জার পিস্তলটা তুলে নেয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে। এক লাফে উঠে দাঁড়াল আহমদ শফিক, সারাটা মুখ কুঁচকে গেছে ব্যথায়, দুই চোখে অবিশ্বাস, চেয়ে রয়েছে নিজের আংগুলহীন বাম হাতের দিকে। কলকল করে রক্ত নেমে আসছে তালু বেয়ে কনুইয়ের দিকে। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল আহমদ শফিক।

এমনি সময়ে বাইরে কড়কড় শব্দে গর্জে উঠল দুটো স্টেনগান। পাঁচ সেকেণ্ড। তারপর পনের সেকেণ্ড চুপচাপ। আবার তিন তিন ছয় সেকেণ্ড আলাদাভাবে শোনা গেল গুলি বর্ষণের শব্দ। পরমুহূর্তে একসাথে পনের বিশটা এল. এম. জি. হুংকার দিয়ে উঠল। স্বস্তি ফুটে উঠল রানার মুখে। এসে গেছে কর্ণেল আলতাফের লোক।

'পাহাড়টা সরান, মশায়!' ককিয়ে উঠল গোপাল ভৌমিক। 'যুদ্ধ জয় করার পর যদি এর চাপে মারা যাই তাহলে দুঃখ রাখবার জায়গা থাকবে না। স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাব না। উফ্, স্লা নড়ান যাচ্ছে না ব্যাটাকে।

বুক ভরে শ্বাস নিল রানা। বেঁচে থাকার আনন্দে হেসে উঠতে ইচ্ছে করছে ওর। কিন্তু বাম হাতের জ্বলুনির চোটে হাসি আসছে না। ঘরের চারিপাশে চোখ বুলাল

সে। চারটে লাশ, তিনটে জখম, উল্টান টেবিল-চেয়ার, ছাদে-দেয়ালে গুলির ক্ষতচিহ্ন—এই সবকিছুর পিছনে রয়েছে এক অদৃশ্য শত্রু, রাজেশ মল্লিক।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ত্রগুলো কুড়াতে শুরু করল রানা। ভৌমিকের মাউযার ছাড়াও পাওয়া গেল আরো পাঁচটা। সবগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বুক শেলফের সবচেয়ে উঁচু তাকে রাখল রানা। শুধু মাউযারটা রাখল হাতে। তারপর টেনে হিঁচড়ে পাঞ্জার চাপমুক্ত করল ভৌমিককে। গুলি খাওয়া ডান হাতটাকে মোটেই কষ্ট না দিয়ে সাবধানে উঠে দাঁড়াল ভৌমিক।

পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে দুজন। গোপাল ভৌমিকের রক্তাক্ত মুখে হাসি ফুটে উঠল। রুমাল বের করে মুছল মুখের রক্ত।

'বেড়ে ফাইট দিয়েছেন মশায়।' এগিয়ে গেল সে বুক শেলফের কাছে, প্লেটদুটো তুলে নিল হাতে। 'আপনার সম্পর্কে অনেক শুনেছি, ডোশিয়ার পড়েছি, কিন্তু আজ সচক্ষে আপনার এ্যাকশন দেখে বুঝতে পারছি কেন আপনাকে ইনডেস্ট্রাক্টিব্‌ল্‌ বলা হয়।' প্লেটগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'এরই জন্যে এত ব্যাপার!'

'আপনার সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার ভৌমিক,' গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল রানা।

'ইউ আর ওয়েল কাম মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড!' হেসে উঠল ভৌমিক। 'কিন্তু আমি আর কি সাহায্য করলাম? সব ত

করলেন আপনিই।' হঠাৎ সচকিত হয়ে বলল, 'চলুন, কেটে পড়া যাক। বাইরে আরো অনেক লোক আছে ওদের। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কেটে পড়তে পারলে বুঝব বেঁচে গেলাম এযাত্রা। নিন, চলুন।'

'দাঁড়ান।'

বেরিয়ে যাচ্ছিল, থেমে পিছন ফিরল গোপাল ভৌমিক। 'কি বললেন?'

কথাটা বলেই রানার হাতের দিকে নজর পড়ল ওর। বিস্ফারিত হয়ে গেল দুই চোখ। প্রকাণ্ড ম্যাউযারটা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওর বুকের দিকে। রানার ঠোঁটে একটুকরো বাঁকা হাসি। হাঁ হয়ে গেল গোপাল ভৌমিকের মুখটা। বার দুই ঢোক গিলে বলল, 'কী ব্যাপার? এর মানে কি!' ভৌমিকের কণ্ঠে বিস্মিত অনুযোগ।

'একটু নড়াচড়া করলেই গুলি করব!' গম্ভীর রানার চোখ মুখ। 'কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন। আপনাকে খুন করতে একবিন্দু অনুশোচনা হবে না আমার।' ভৌমিকের উপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই উঁচু গলায় ডাকল রানা রিতাকে। 'বেরিয়ে এসো রিতা। আর কোন ভয় নেই।'

রানার মুখের দিকে চেয়ে একচুল নড়বার সাহস হল না ভৌমিকের। কি বলবে বুঝতে না পেরে বার কয়েক ঢোক গিলল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল রিতা। রানার দিকে চোখ পড়তেই আঁৎকে উঠল সে। রক্তে ভিজে

গেছে রানার কোটের বাম হাতা। 'রানা! জখম হয়েছ তুমি। কোথায় লেগেছে...' দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছিল রিতা, পিস্তলটা দেখে থমকে দাঁড়াল। পিস্তলের নিশানা অনুসরণ করে চাইল দরজার দিকে।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রিতা গোপাল ভৌমিকের দিকে, হতবাক হয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে, শিউরে উঠল একবার, তারপর ফিরল রানার দিকে।

'রানা! এই তো রাজেশ মল্লিক!'

মৃদু হাসল রানা। বলল, 'আমি জানি।'

মোল

'কি করে জানলে?' শান দেয়া ছুরির মত চকচকে একজোড়া চোখের দৃষ্টি স্থির হল রানার চোখে। 'কি করে টের পেলে যে ওই রাজেশ মল্লিক?'

'প্রথম থেকেই ওর গতিবিধি সন্দেহজনক ছিল, স্যার' বলল রানা। 'কিন্তু ততটা পরিষ্কার ভাবে বুঝিনি। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়েছে আমার ধারণাটা।'

'আরেকটু খুলে বল।' একটা ফাইভ ফিফটি ফাইভ

থরিয়ে নড়েচড়ে বসলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। রানার পাশে বসা রিতার মুখের উপর সস্নেহ দৃষ্টি বুলালেন। কট্টর বুড়োর মন জয় করতে রিতার লেগেছে মোট সাড়ে দশ সেকেণ্ড। সৌন্দর্য, অল্প বয়স, ইত্যাদি সমস্ত দোষ মাফ করে দিয়েছেন উনি। ফিরে এল ক্ষুরধার দৃষ্টিটা রানার মুখের উপর, এবং মুহূর্তে কঠোর হয়ে গেল। কথাগুলো মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে শুরু করল রানা।

'ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিসের এ্যাকটিভ কোন এজেন্ট দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত যাকে তাকে গুলি করে হত্যা করবে, এটা ঠিক ভাবা যায় না, স্যার। কিন্তু তাই ঘটতে যাচ্ছিল আহমদ শফিকের আটরার আস্তানায়। বিনা দ্বিধায় পিস্তল তুলেছিল সে নিরস্ত্র আহমদ শফিকের বুকের উপর, গুলিও করেছিল, কিন্তু আমি থাবা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলাম পিস্তলের মুখ।

'তাছাড়া সেখান থেকে খুলনা ফিরবার পথে ওর সাজান গল্পগুলো ঠিক পুরোপুরি হজম করতে পারিনি, স্যার। দেবাশীষ আর রাজেশ মল্লিক অদৃশ্য হয়ে যাবার পরেও কেন পুরো চব্বিশ-পঁচিশ ঘণ্টা সে ভাটপাড়ায় বসে থাকল তার কোন যুক্তিসংগত কারণ আমি বের করতে পারিনি। ওর জানা ছিল কি জিনিস ডেলিভারী নিয়েছিল দেবাশীষ ভাটপাড়ায় নিযামুদ্দিনের ছাপাখানা থেকে, ওর জানা ছিল কলকাতায় কোথায় কোথায় যায় দেবাশীষ, কার কার সাথে মেলামেশা করে—তারপরেও কেন ও ভাটপাড়ায়

বসেছিল গালে হাত দিয়ে বুঝতে পারিনি আমি।

'তারপরেই ইজ্জত আলী এসে হাজির হল দেবাশীষের নোটবুক নিয়ে। আমি গোপাল ভৌমিককে বলেছিলাম, টাকা ছাপার অফসেট প্লেটের ব্যাপারে আমার কোন উৎসাহ নেই, ওসব পুলিশের ব্যাপার, দেবাশীষের মেসেজটা পেলেই আমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব। এই কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবার আধঘন্টার মধ্যেই যখন নোটবুক নিয়ে হাজির হল তোতলা ইজ্জত আলী, এবং বলল রাজেশ মল্লিক দিয়েছে ওটা ওকে, বলেছে ওটা পেলেই কেটে পড়ব আমি, তখনই আসলে সন্দেহটা দানা বাঁধল আমার।

'তাছাড়া স্যার, বুঝতে পারছিলাম, আমার আশেপাশেই রয়েছে রাজেশ মল্লিক। সবসময় আমার চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে রয়েছে—অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন ওকে? অশরীরি প্রেতাত্মার মত আমার চারিপাশে ঘুরছে একজন লোক, আমার প্রতিটা আমার কার্যকলাপ দেখছে, আমার কথাবার্তা শুনছে, অথচ আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কেন? এর সহজতম সমাধান যা মাথায় এল, তা হচ্ছে আসলে নিশ্চয়ই দেখেছি আমি লোকটাকে। প্রশ্ন এল: কে সে? গোপাল ভৌমিক?

'এই সন্দেহের ফলেই গতকাল সন্ধ্যায় যখনই দেখলাম গোপাল ভৌমিকের ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে, তখন প্রথম সুযোগেই সরিয়ে দিলাম আমি রিতাকে বৈঠকখানা থেকে। কারণ, আমার অনুমান

যদি সত্য হয়, তাহলে পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এড়াবার জন্যে দেখামাত্র গুলি করবে ও রিতাকে। ভাব দেখাবে ভুল হয়ে গেছে তাড়াহুড়োয়। আমি চাইলাম, ও মনে করুক ওকে গোপাল ভৌমিক হিসেবেই জানি আমি এখনো। এতে সুবিধা হয়েছিল কিছুটা। সব যখন শেষ হয়ে গেল তখন ওর দিকে এক নজর চেয়েই বলে দিল রিতা যে ও রাজেশ মল্লিক। সন্দেহ রইল না আর।'

একটানা এতক্ষণ কথা বলে থামল রানা। চুপচাপ কয়েক সেকেণ্ড ভাবলেন মেজর জেনারেল। তারপর ঝট করে ফিরলেন রানার দিকে।

'রাজেশ মল্লিকের সাহায্য যদি না পেতে তাহলে কিভাবে উদ্ধার পেতে, রানা? অতবড় ঝুঁকি নেয়া কি ঠিক হয়েছিল?'

মাথা নীচু করে হাসল রানা। বলল, 'এছাড়া আর কোন পথ ছিল না, স্যার। তাছাড়া রাজেশের ওপর ভরসা করে ত কোন ঝুঁকি নিতে যাইনি আমি। আমার নিজস্ব প্ল্যান ছিল। হঠাৎ রাজেশ গিয়ে হাজির হওয়ায় আমার প্ল্যান পাল্টাতে হয়েছিল। ও বরং অসুবিধাই সৃষ্টি করেছিল আমার। কোন সাহায্যেই আসেনি। আগাগোড়া সব কিছু একাই করতে হয়েছে আমাকে। একবার দুই সেকেণ্ডের জন্যে ব্যবহার করেছিলাম শুধু ওকে।

চুপচাপ কিছুক্ষণ সিগারেট টানলেন মেজর জেনারেল, তারপর বললেন 'এদিকের খবর সব শুনেছ?'

'কিসের খবর স্যার?'

'দেবাশীষের রিপোর্ট পৌঁছবার পরের খবর?'

'না স্যার। কিছুই শুনিনি এখনো।'

'প্রায় সবকটাকেই ধরা গেছে। বাকিগুলোও ধরা পড়বে দুই একদিনের মধ্যেই।'

রিতার দিকে ফিরলেন বৃদ্ধ। মধুর হাসি হাসলেন। 'এখন কি করবে রিতা? ঢাকায় থাকবে, না খুলনায় ফিরে যাবে? কি ভাবছ?'

মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল রিতা, 'কিছুই ঠিক করিনি এখনো।'

'কোন রকমের সাহায্য প্রয়োজন মনে করলেই নিঃসংকোচে জানাবে আমাদের। কেমন? দেবাশীষের ছোট বোনের জন্যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট সাধ্যমত সব-কিছুই করবে। ওর মৃত্যুতে আমরা সবাই মর্মাহত। দেবাশীষ আমাদের সেরা এজেন্টকে চেয়েছিল, আমি পাঠিয়েছিলাম পৃথিবীর সেরা…' হঠাৎ থেমে গেলেন বৃদ্ধ, তারপর বললেন, 'মানে,…' শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না, খানিকক্ষণ চেষ্টার পর রেগে গেলেন রানার উপর, কটমট করে চেয়ে বললেন, 'তুমি কি শুনছ বসে বসে? যাও না। রিতা যাবে পাঁচ মিনিট পর।'

মুচকি হাসি গোপন করে উঠে পড়ল রানা।

নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।